নাটকটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন বঙ্গসমাজ এই নতুন নাট্যকারকে চিনে নিতে দেরি করেনি। বস্তুত, নাটক যে সমসময়ের প্রত্যক্ষ ফসল, এমনকি তা যে সমসময়কে প্রভাবিত করতেও সক্ষম এ বিশ্বাস 'নীলদর্পণ' নাটকের সূত্রে তৈরি হওয়া সমাজ আন্দোলনের ঐতিহাসিক বাস্তবয়তায় প্রত্যয়িত হয়েছে। এই নাটকটি অনুবাদ করে মধুসূদন দত্তের জেল ও জরিমানা হয়। ইংলণ্ডে 'Indigo Commission' বসে এবং ক্রমে নীলচাষ রদ হয়। দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় (১) সামাজিক নাটক—'নীলদর্পণ'। (২) রোমান্টিক নাটক—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) (৩) কমেডি নাটক—'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২)। এই নাটকগুলির মধ্যে বিশেষত 'সধবার একাদশী' পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। সমসাময়িক বাংলার ক্ষয়িষ্ণু ও উন্মার্গগামী মূল্যবোধহীন সমাজের চিত্রায়ন এবং নিমচাঁদের মতো যুগসন্ধির বলিপ্রদত্ত সিরিও-কমিক চরিত্রচিত্রণে দীনবন্ধু অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছেন।

মনোমোহন বসুর নাটকগুলিতে বাঙালির জাতীয় প্রবণতার সন্ধানের একটি চেষ্টা দেখা যায়। যাত্রার মতো তাঁর নাটকগুলিও ঘটনা শ্লথতায় আক্রান্ত, আবেগসর্বস্ব এবং সংগীতপ্রবণ। তাঁর লেখা পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের মধ্যে 'রামাভিষেক' (১৮৬৭), 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫), 'পার্থ পরাজয়' (১৮৮১), 'রামলীলা' (১৮৮৯) 'আনন্দময়' (১৮৯০)—এর নাম করা যায়। এই নাটকগুলির মধ্যে স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনাও পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখব। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ' (১৮৭৮) নাটকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সফল প্রয়োগ লক্ষ করা যায় যা পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের হাতে গৈরিশ ছন্দের রূপ নেবে। তাঁর 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'নরমেধ যজ্ঞ', 'অনলে বিজলী' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক 'বিক্রমাদিত্য' এবং 'কলির প্রহ্লাদ', 'জাগো পাগলা' ইত্যাদি প্রহসন যথেষ্ট প্রসাদগুণের অধিকারী। এই সময়ের মধ্যে কামিনী সুন্দরী দেবীর তিনটি নাটকের নাম জানা যায়, যথা-'ঊর্বশী', 'ঊষা' ও 'রামের বনবাস'। সম্ভবত, তিনিই বাংলার প্রথম মহিলা নাট্যকার।

বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগে লেবেদেফ বা চৌরঙ্গির সাঁসুসি থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হলেও সেখানে দেশীয় মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। আর তার পরে শ্যামবাজার, জোড়াসাঁকো বা বেলগাছিয়া সর্বত্রই জমিদার ও ধনী মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের প্রাসাদ মঞ্চেই নাটকের অভিনয় চলেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই নাট্যমঞ্চগুলির স্বাভাবিক ভাবেই তাই কোনো যোগ ছিল না। মঞ্চমালিক বা তার অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়ের রুচি ও খামখেয়ালের বশেই অধিকাংশ সময়ে নাটকের অভিনয় বা নির্বাচন নির্ভর করত। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিয়মিত নাটকাভিনয়ের সুযোগ যেমন তৈরি হলো, তেমনই বাংলা থিয়েটারও বাধ্য হলো দর্শক চাহিদা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রাখতে। আর এই যে দু-আনা পয়সা থাকলেই সমাজের যে কোনো শ্রেণির মানুষ রঙ্গমঞ্চে গিয়ে টিকিট কেটে নাটক দেখতে পারলেন, মতামত দিতে পারলেন, এভাবে এই প্রথম বাংলা থিয়েটারের প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণ ঘটল। পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রসারও সম্ভব হলো এই প্রেক্ষিতেই। যে জাতীয়তাবাদের কথা আগে বলা হলো, তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। হিন্দুমেলা (১৮৬৭), শিবাজী উৎসব বা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন কেবল অতীতমুখিনতায় ডুবে না থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অর্থাৎ জাতীয় জাগরণের একটি সর্বাঙ্গীন

রূপের হদিশ পেতে বদ্ধপরিকর ছিল। নাটকের মধ্যেও সেই কর্মপ্রবর্তনাময় আদর্শের ছাপ প্রথম যে দুজনের নাটকে ধরা পড়েছিল তাঁরা হলেন হরলাল রায় আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হরলালের 'হেমলতা' (১৮৭৩) ও 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪) নাটক দুটিতে পরাধীনতার বেদনাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া 'বেণীসংহার' অবলম্বনে 'শত্রুসংহার', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অনুকরণে 'কনকপদ্ম' ও 'হ্যামলেট' অনুকরণে 'রুদ্রপাল' উল্লেখ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এ যুগের প্রথম নাট্যকার, জাতীয় প্রণোদনা ছাড়াও যাঁর নাট্যশৈলীও নি:সংশয়াতীত প্রশংসার দাবি রাখে। ১৮৭২-এ লেখা 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ থাকলেও পরবর্তীকালের নারীস্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনে এই মানুষটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন 'অলীকবাবু' (১৮৭৭) প্রথমে 'এমন কর্ম্ম আর করব না' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয় এবং বিতর্কের অবকাশ থাকলেও সম্ভবত এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ফরাসি নাট্যশৈলীর প্রভাব এই নাটকটিকে বিশেষ স্বাদমাধুর্য দিয়েছে। তাঁর অন্যান্য প্রহসনগুলি হলো 'হিতে বিপরীত', 'হঠাৎ নবাব', 'দায়ে পরে দারগ্রহ'। অনুবাদ নাটকের মধ্যে রয়েছে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশী', 'মালতীমাধব', 'জুলিয়াস সীজার' প্রভৃতি। মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক, আর তাঁর শেষ মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) ইতিহাসাশ্রিত হলেও মূলত রোমান্সের জগতেই বিচরণশীল থেকেছে। এই সময়ের আরেকজন স্মরণীয় মানুষ উপেন্দ্রনাথ দাস। এঁর লেখা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকের অভিনয় সরকারি আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরাধীনতার ক্ষোভ এবং হুগলি জেলার শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যাভিচারের বাস্তব কাহিনি যুক্ত হয়ে এই নাটকটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী' নামে একটি নাটক এবং 'দাদা ও আমি' নামে একটি প্রহসন রয়েছে।

মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটক তথা বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান অসামান্য। গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র নাট্যকার ছিলেন না, নট, নির্দেশক, সংগঠক তথা গোটা একটা যুগের ধারক ছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বস্তুত তাঁকে কেন্দ্র করেই এই সময় অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বিনোদিনী দাসী প্রমুখ ইতিহাসখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নাট্যকারের সমাবেশ ঘটেছিল। বাংলা থিয়েটারের প্রয়োজনে সবশুদ্ধ ৭৫টি সম্পূর্ণ ও ৪ খানি অসম্পূর্ণ নাটক-নাটিকা-প্রহসন তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকেই স্বদেশপ্রীতি এবং ধর্মোন্মাদনা উচ্ছ্বসিত আবেগবাহুল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রজ মনোমোহন বসুর মতোই তিনি বাঙালি দর্শক সাধারণের নাড়ি চিনতে পেরেছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ ও ভাবপ্রভাবে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হল—'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩), চৈতন্যলীলা (১৮৮৫), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৫), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১৮৮৬), 'প্রফুল্ল' (১৮৯১), 'জনা' (১৮৯৩); 'বলিদান' (১৯০৫), 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬) প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ' 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' 'চোখের বালি' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাট্যানুবাদও একসময় যথেষ্ট মঞ্চসফল হয়েছিল। এছাড়া অপেরাধর্মী 'আবু হোসেন' বা প্রহসন 'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গিরিশচন্দ্রের পরেই নট ও নাট্যকার রূপে নাম করতে হয় অমৃতলাল বসুর। তাঁর 'হীরকচূর্ণ', 'হরিশচন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী' ইত্যাদি গম্ভীর নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকগুলি বিভিন্ন দুর্বলতার শিকার। তাঁর

নিজস্ব ক্ষেত্র ছিল হাস্যময় ও শ্লেষ বিদ্রুপাত্মক রঙ্গ রচনার পরিসর। বাঙালি দর্শক সার্থভাবেই এই মানুষটিকে ‘রসরাজ’ অভিধায় অভিহিত করেছে। তাঁর ‘কৃপণের ধন’, ‘চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে’, ‘বিবাহ বিভ্রাট’, ‘বাবু’, ‘খাসবদল’, ‘বন্দেমাতরম্’ প্রভৃতি রচনা কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। এই সময়ের আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনিকে যেমন উনিশ শতকীয় মানবতাবাদী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্নির্মিত করেছেন, তেমনই স্বদেশভক্তির উদ্দীপনাও প্রবলভাবে তাঁর নাটগুলিতে লক্ষ করা যায়। তবে, আবেগের অতিশায়িতা নয়, বরং পরিচ্ছন্ন গঠনশৈলীর জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে ‘ভীষ্ম’, ‘নরনারায়ণ’, ‘আলিবাবা’, ‘প্রতাপাদিত্য’, ‘আলমগীর’ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য। ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক ও দেশি-বিদেশি উপকথাভিত্তিক নাটক মিলিয়ে তাঁর মোট নাট্যসংখ্যা প্রায় ৪০টি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন এযুগের অন্যতম জনপ্রিয় নাট্যকার। তিনি শেক্সপীয়র নাট্য আঙ্গিকের অনুসরণে এবং প্রাণবান জীবনরসের সংযোজনে রোমান্টিক কমেডি নাট্য, ঐতিহাসিক বিষয়াশ্রিত, স্বদেশী-ভাবাপন্ন এবং সামাজিক ও পৌরাণিক নাটক—সর্বক্ষেত্রেই অনায়াস সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটকের মধ্যে ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫), ‘দুর্গাদাস’ (১৯০৬), ‘নূরজাহান’ (১৯০৮), ‘মেবার পতন’ (১৯০৮), ‘সাজাহান’ (১৯০৯), ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (১৯১১) ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে সামাজিক নাটক ‘পরপারে’, পৌরাণিক গীতিনাটিকা ‘সীতা’ ও ‘পাষাণী’ এবং ‘কল্কি অবতার’, ‘পুনর্জন্ম’ প্রভৃতি প্রহসনগুলি আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে।

আগেই বলা হয়েছে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিয়েটারেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ লক্ষণ ধরা পড়তে শুরু করেছিল। ‘নীলদর্পণ’ নাটকের অভিনয় দিয়েই জাতীয় রঙ্গালয়ের উদ্বোধন ঘটে এবং এই সময় থেকেই ব্রিটিশ সরকার থিয়েটারের ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। ১৮৭২-এ ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ নীলদর্পণের বিতর্কিত অংশগুলি বাদ দিয়ে অভিনয় করলেও ‘ইংলিশম্যান’ কাগজের সমালোচনা এবং পুলিশি পরিদর্শনের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৮৭৬ নাগাদ বেঙ্গল থিয়েটার এবং ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙা নবগঠিত ‘গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার’ বিভিন্ন সামাজিক, পৌরাণিক বা প্রহসনমূলক নাটকের সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘পুরুবিক্রম’, কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভারতে যবন’, হরলাল রায়ের ‘বঙ্গের সুখাবসান’, ‘হেমলতা’, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গুইকোয়ার’ অমৃতলালের ‘হীরকচূর্ণ’, উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ সরোজিনী’, ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’, ‘হনুমানচরিত্র’, ‘পুলিস অফ পিগ অফ শিপ’ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। এই নাটকগুলির অধিকাংশেরই বিষয় ছিল সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা বিস্তারের নগ্ন আস্ফালন। এই সময় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের ‘চা-কর দর্পণ’ নাটকটি প্রকাশ হলে নীলদর্পণের অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী ব্রিটিশ সরকার চা-ব্যবসায়ের উপর আঘাত আসার আশঙ্কায় মরিয়া হয়ে উঠল। সরকারের এই দমনমূলক মনোভাবের পিছনে নীতিবাগীশ মধ্যবিত্ত বাঙালির পরোক্ষ ইন্ধনও কিছু কম ছিল না। রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের উপস্থিতিতে এই শিক্ষিত নাগরিক ভদ্রসমাজ অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে থিয়েটারকে জল-অচল করতে চেয়েছিলেন। এই দুই শক্তির সমবেত উদ্যোগের ফসল ১৮৭৬-এ অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন, যা ঐ বছর ১৬ ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক লিপিবদ্ধ করেন। আইনের জমি আগে থেকে প্রস্তুত থাকলেও উপলক্ষ ছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্-এর ভারত-আগমন ও নানরকম বেয়াড়া আবদারের কাহিনি নিয়ে লেখা

উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ নাটকটি। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি নাটকটি দুবার অভিনয়ের পরেই পুলিস এর বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে। নাটকটির নাম পাল্টে ‘হনুমান চরিত্র’ রেখে ২৩ তারিখ আবার অভিনয়ের পর তৎক্ষণাৎ পুলিস তা নিষিদ্ধ করে। এই দমন-পীড়ন চলতেই থাকে এবং ঐ বছর ৪ ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ-সহ মঞ্চমালিক ভুবমোহন নিয়োগী অশ্লীলতার দায়ে গ্রেপ্তার হন। এই বিচার নিয়ে পত্র-পত্রিকা সহ জনমানসে অনেক আলোচনা হয় এবং কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জন উপেন্দ্রনাথদের পক্ষে দাঁড়ালে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের নামমাত্রা সাজা হয়। কিন্তু এর পরপরই ব্রিটিশ সরকার ‘অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন’ (১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৬) ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮ মার্চ, ১৮৭৮) এবং আর্মস অ্যাক্ট প্রণয়ন করে ভারতবাসীর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ এবং নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে আইন করতে বাধ্য হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা যে এইসময় ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ইংরেজ সরকারের আচরণে তা প্রমাণিত হলো।

সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করেছেন এবং নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। বস্তুত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ও আবহেই তাঁর শৈশব কেটেছে। কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ-সহ অভিনয়ও করেছেন তিনি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অপরিণত বয়সেই ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ বা ‘কালমৃগয়া’র মতো গীতিনাট্যে তাঁকে হাত পাকাতে দেখা যাবে। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কৌতুকনাট্য সামাজিক, ঐতিহাসিক—বিবিধ ধারার নাটক রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি তাঁর রূপক-সাংকেতিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী নাটকগুলিতে। যদিও সমসময়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক জোড়াসাঁকো বা বিশ্বভারতীর নিজস্ব প্রযোজনা ছাড়া সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রায় কখনই গৃহীত হয়নি। অনেক পরে মূলত বহুরূপী নাট্যদলের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটকগুলি প্রকৃত মঞ্চসাফল্য অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) গীতিনাট্য—বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮২)।

(২) কৌতুক নাট্য—গোড়ায় গলদ (১৮৮২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৫)।

(৩) রূপক সাংকেতিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী নাটক—শারদোৎসব (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬) গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯১৯), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকবরী (১৯২৪), পরিত্রাণ (১৯২৯), কালের যাত্রা (১৯৩২), রথের রশি (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)।

(৪) সামাজিক নাটক—গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), বাঁশরী (১৯৩৩)।

(৫) নৃত্যনাট্য—শাপমোচন (১৯৩১), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৭), শ্যামা (১৯৩৯)।

(৬) বিবিধ—রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), রাজা ও রানী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৯৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), মালিনী (১৮৯৬), নরকবাস (১৯০০), গান্ধারীর আবেদন (১৯০০), কর্ণকুন্তীসংবাদ (১৯০০)।

তাঁর বিবিধ নাটকের মধ্যে ‘রক্তকবরী’, ‘মুক্তধারা’, ‘ডাকঘর’, ‘অচলায়তন’, ‘তাসের দেশ’ ‘অরূপরতন’, ‘রাজা’ বা ‘রথের রশি’ দেশ-কাল-সমাজ-সম্পর্ক-অর্থনীতি-রাজনীতি সহ জীবনরহস্যের গভীর অনুধ্যানে শাশ্বতভাবে প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্র সমসাময়িক ও পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে অপরেশচন্দ্রের ‘কর্ণার্জুন’, যোগেশ চৌধুরীর ‘সীতা’, শচীন সেনগুপ্তর ‘সিরাজদৌল্লা’ ও ‘গৈরিক পতাকা’, মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’, ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’, ‘লাঙল’, ‘বন্দিতা’, বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘মাটির ঘর’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী জোড়া অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অব্যবস্থা, বিজিত দেশগুলির সম্মিলিত উষ্মা এবং ১৯২৯-এর বিশ্বজোড়া বিরাট আর্থিক মন্দায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা প্রকাশ্যে আসে। এই সুযোগে ইতালি, জার্মানি, স্পেন, গ্রিস ও জাপানে দেশাত্মবোধের মুখোশে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। রোমা রোঁলাঁ, আদ্রেঁ জিঁদ, এপকেনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ সহ পৃথিবীর তাবৎ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী গণতন্ত্র ও মানবিকতার মৃত্যুতে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ার শপথ নেন। ফেদেরিকো লোরকা, র‍্যালফ্ ফক্স সহ অনেকেই উদ্দীপনা এনেছিল এবং তারাও সাম্রাজ্যবাদ সহ ফ্যাসিজমের তীব্র নিন্দা করেছিল। ভারতে এই পরিপ্রেক্ষিতেই গণনাট্য সঙ্ঘ তথা গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা। IPTA (Indian Peoples' Theatre Association) ছিল কম্যুনিস্ট পার্টিরই সাংস্কৃতিক মঞ্চ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে যোগ রেখেই এদেশেও ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল। এর পরপরই স্থাপিত হয়েছিল প্রগতি সাহিত্য শিল্পী সঙ্ঘ। এই সংগঠনগুলিরই উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৯৪৩-এর মে মাসে অধুনা মুম্বাই-এ সোভিয়েত বা চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং রোমা রোলাঁ, ব্রেখট্ প্রমুখের আদর্শ Peoples' Theatre বা জনগণের থিয়েটারের আদর্শকে মাথায় রেখেই IPTA-র প্রতিষ্ঠা। IPTA-র বুলেটিনে বলা হল— ‘The movement seeks to make our art the expression and organism of our people's struggle for freedom, economic justice and democratic right,.........the movement seeks to stand against fascism and imperialism and everything which is against of our people.’

গণানাট্যের আদর্শগুলিকে সূত্রাকারে প্রকাশ করা যাক—

(১) নাটক বা যে কোনো শিল্পে বাস্তব জীবনসমস্যার রূপায়ণ থাকবে। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধ সেই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাও চিত্রিত হবে।

(২) ব্যক্তিকে বিশিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করে দেখাতে হবে তার শ্রেণি মানসিকতার রূপায়ণও থাকা চাই।

(৩) ব্যক্তিনায়কের পুরনো চিন্তার অনুবর্তন চলবে না, মুখ্য হয়ে উঠবে সমষ্টির কথা।

(৪) শিল্পের উদ্দেশ্য হবে জনতার মনোরঞ্জন, একই সঙ্গে শিক্ষা বিধান। জনগণের দুর্দশার মূল কারণ এবং তার পরিবর্তনের উপায় সম্বন্ধে তাদের সচেতন করানো।

(৫) লোকসংগীত, লোকশিল্প, লোকউৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে লোকহৃদয়ের স্পন্দন বুঝতে চাওয়া এবং নাগরিক মধ্যবিত্ত সংস্কার ত্যাগ করে শ্রমজীবী ও গ্রামীণ লোকমানসের কাছাকাছি যাওয়া। তুলসী লাহিড়ী (১৮৭৯-১৯৫৯) ছিলেন একাধারে নট, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ পরিচালক এবং সঙ্গীতকার। ১৩টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ১৬টি একাঙ্ক নাটক এবং একটি নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো—'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭), 'ছেঁড়া তার' (১৯৫৩), 'বাংলার মাটি' (১৯৫৩), 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯), 'ঝড়ের মিলন' (১৯৬০) ইত্যাদি। নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'নাট্যকারের ধর্ম' (১৯৬০) তাঁর নাট্যদর্শনের প্রতিফন স্বরূপ। IPTA-র সাহিত্যাদর্শ মেনেই তুলসী লাহিড়ীর নাটক সমষ্টিজীবনের কথা তুলে ধরেছে, আঞ্চলিক জীবন ও লোকজীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রণে যত্নবান থেকেছে এবং হয়ে উঠেছে শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার।

গণনাট্য পর্বের আর একজন উল্লেখ্য নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০) শ্রেণি চেতনার আদর্শে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের সমস্যা ও সংকট, দেশভাগজনিত মানুষের বিপর্যয় ও ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তা, সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, শাসক শ্রেণির দমনপীড়ন এবং শ্রমিক—কৃষকের দুঃসহ জীবনচর্যা তাঁর নাটকে স্থান করে নিয়েছে। 'আহুতি' (১৯৩২), 'দীপশিখা' (১৯৪৩), 'তরঙ্গ' (১৯৪৬), 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'অন্তরাল' (১৯৪৪), 'মশাল' (১৯৫৪), 'অমৃতসমান' (১৯৬৯), 'স্বর্গের সিঁড়ি (১৯৮২) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক।

নাট্যকার, অভিনেতা, সংগীতবিদ্ এবং বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭২) ছিলেন বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ১৯৪২-এ কম্যুনিস্ট পার্টি ও যথাক্রমে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও IPTA-র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৯৪৩ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নবান্ন' নাটকটির ১৯৪৪ সালের ২৪ এ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয়ের পর থেকেই বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হলো বলা যেতে পারে। 'নবান্ন' ছাড়াও তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬), 'অবরোধ' (১৯৪৭), 'জতুগৃহ', (১৯৬২), 'গোত্রান্তর' (১৯৫৭), 'ছায়াপথ' (১৯৬১), 'মাস্টারমশাই' (১৯৬১), 'দেবীগর্জন' (১৯৬৯), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৬৬), 'ধর্মগোলা' (১৯৬৭), 'আজ বসন্ত' (১৯৭০), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৭১), 'সোনার বাংলা' (১৯৭১) উল্লেখ্য। একাঙ্ক নাটকের মধ্যে 'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'জননেতা' (১৯৫০), 'লাশ ঘুইর‍্যা যাউক' (১৯৭০), 'হাঁসখালির হাঁস' (১৯৭৭) এবং গীতিনাট্য 'জীয়নকন্যা' (১৯৪৮) এবং রূপক নাট্য 'স্বর্ণকুম্ভ' (১৯৭০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুম্বাই এবং টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গেও চিত্রনাট্যকার হিসেবে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং হিন্দি ও বাংলা ভাষায় 'নাগিন', 'বসু পরিবার', 'সাড়ে চুয়াত্তর' প্রভৃতি জনপ্রিয় ছায়াছবির চিত্রনাট্য তাঁর রচনা। IPTA-র সাহিত্য আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিফলন দেখা যায় বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকৃতিতে, দুর্গতি, মন্বন্তর বা বিভীষিকাই নয়, বেঁচে ওঠার সংকল্পে, প্রতিরোধের দৃঢ়তায়, নবজীবনের আহ্বানে তাঁর নাটক সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সময়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্বদের মধ্যে সলিল সেন ('নতুন ইহুদী', 'মৌ চোর', 'দর্পণ') কিরণ মৈত্র ('বারো ঘণ্টা', 'চোরাবালি', 'সংকেত', 'নাটক' নয়'), ধনঞ্জয় বৈরাগী/তরুণ রায় ('রুপোলি চাঁদ', 'একমুঠো আকাশে', 'এক পেয়ালা কফি') বীরু মুখোপাধ্যায় ('সংক্রান্তি', 'এতটুকু বাসা'), গঙ্গাপদ বসু ('জীবনায়ন', 'সত্য মারা গেছে', 'নমো যন্ত্র', 'বিশ্বাসের মৃত্যু'), পরেশ ধর ('ছায়া', 'ডানা ভাঙা পাখি', 'কালপুরী'), ঋত্বিক ঘটক ('দলিল', 'গ্যালিলিও', 'জ্বালা') প্রভৃতি উল্লেখ্য।

গণনাট্যের পরবর্তী পর্যায় নবনাট্য আন্দোলন। নবনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গঙ্গাপদ বসু লিখেছেন—''রবীন্দ্রনাথের ক্লাসিক পর্যায়ের নাটকের কথা, যেগুলোকে অনায়াসেই নবনাট্যের নাটক বলতে

পারি, আবার আধুনিক কালের কোনো রচনাকে হয়তো নবনাট্যের নাটক নাও বলা যেতে পারে। মোটামুটি বলা যায়, সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবনগঠনের মহৎ প্রয়াস সে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক এবং এইরকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ সচেতন শিল্পীর মতো ও রিয়ালিটির যে অন্বেষণ তাকেই বলতে পারি নবনাট্য আন্দোলন।" বস্তুত, গণনাট্য-প্রবর্তিত নব্যরীতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে সহমত পোষণ করলেও কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের সীমায় নিজেদের আবন্ধ করতে না চেয়ে যে সমস্ত নাট্যদলগুলি উদ্ভূত হয়, নবনাট্য নামে সেই দলগুলিই চিহ্নিত হয়েছে। পূর্বোক্ত নাট্যকারদের অধিকাংশই গণনাট্য ও নবনাট্য উভয় আন্দোলনেরই শরিক ছিলেন, কিন্তু নবনাট্যের সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে মানুষটি, তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্র (১৯২৫-১৯৯৭)। নাট্যকার হিসেবেও তাঁর অবদান অসীম। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'ঘূর্ণি', 'কাঞ্চনরঙ্গ', সফোক্লেস অনুসরণে 'রাজা অয়দিপাউস', ইবসেনের অনুসরণে 'পুতুলখেলা', 'গর্ভবতী বর্তমান', 'অতুলনীয় সংবাদ', 'বিভাব', 'চাঁদবণিকের পালা' উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালে বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথ, সফোক্লেস, ইবসেন প্রমুখের দেশি-বিদেশি নাটকের সফল মঞ্চ প্রযোজনা, থিয়েটারের নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সর্বোপরি জীবনের প্রতি দায়বন্ধতায় তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্রর (১৯২৫-১৯৮৯) আধুনিক নাট্যশিল্পে অভিনেত্রী ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালিকা হিসেবে কৃতিত্ব সমাধিক হলেও বেশ কিছু নাটক এবং নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা। 'শিবতোষ ভাদুড়ী' ছদ্মনামে তিনি বেশ কিছু গল্প ও নাটক রচনা করেন, তাঁর রচনাগুলির মধ্যে 'বলি', 'ইদুঁর', 'সুতরাং', 'প্রহরশেষে', 'কে?', 'বিদ্রোহিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ের আরও দু'জন উল্লেখ্য নাট্যকার সুনীল দত্ত ('জতুগৃহ', 'হরিপদ মাস্টার', 'সংবিধান বিভ্রাট', 'মালাবদল', 'বর্ণপরিচয়') এবং উমানাথ ভট্টাচার্য ('সমান্তরাল', 'ছারপোকা', 'সকাল সন্ধ্যার নাটক')।

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম এবং সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা নাটকের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১)। পেশায় নগর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কলাবিদ্, এমনকি এ বিষয়েও তাঁর বই রয়েছে। অথচ, পঞ্চাশের দশকের পর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় সামুয়েল বেকেট, হ্যারল্ড পিন্টার, লুইজি পিরানদেল্লো প্রমুখের প্রবর্তনায় আপাত অর্থহীন যে অ্যাবসার্ডিটি ও যাদুবাস্তবতা আধুনিক নাটকের প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠল, বাংলা নাটকে তার সার্থক প্রয়োগের কৃতিত্ব বাদল সরকারেরই প্রাপ্য। তাঁর নাট্যাদর্শ প্রসেনিয়াম মঞ্চ ও পেশাদারি বাজার-নির্ভর কিংবা দলীয় প্রতিষ্ঠানমুখী থিয়েটার চর্চার বাইরে এক তৃতীয় ধারার নাট্যচর্যা শুরু করে। এই প্রণোদনা থেকেই ১৯৬৮ সালে তিনি 'শতাব্দী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও পথনাটক অথবা অঙ্গনমঞ্চের নাটকের নিয়মিত চর্চা করে চলেছে। বাদল সরকারের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫), 'বাকী ইতিহাস' (১৯৬৭), 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৬৭), ত্রিংশ শতাব্দী' (১৯৬৯), 'মিছিল' (১৯৭৪), 'ভোমা' (১৯৭৫), 'সুখপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯৭৬) প্রভৃতি। ১৯৭২-এ হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' উপন্যাসের নাট্যায়নও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ অনুযায়ী নাটকের আদি-মধ্য-অন্তের সুসমঞ্জসতা সযত্নে পরিহার, ইঙ্গিতধর্মী সংলাপের ব্যবহার, বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তুখোড় রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং যুগযন্ত্রণা-কাতর বিচ্ছিন্ন অসহায় মানুষের বেদনাই বারংবার তাঁর নাটকে উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

নট, নাট্যকার, সংগঠক, রঙ্গমঞ্চ পরিচালক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) আধুনিক নাট্য সাহিত্যের ও নাট্যকলার জগতে প্রাত:স্মরণীয়। তিনি ১৯৪৭ সালে 'দ্য শেক্সপিরিয়ান' নামের দল গড়েন।

১৯৫১ সালে গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্য হন। পরবর্তীকালে লিটল থিয়েটার গ্রুপে কিছুদিন নাটক করার পর ১৯৬৯ সালে 'পিপল্স্ টিল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে 'ছায়ানট' (১৯৫৪), 'অঙ্গার', (১৯৫৯), 'ফেরারি ফৌজ' (১৯৬১), 'কল্লোল' (১৯৬৮), 'মানুষের অধিকার' (১৯৬৮), 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭৩), 'ব্যারিকেড' (১৯৭২), 'রাইফেল' (১৯৬৮), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (১৯৭৫)। এছাড়া 'তিতুমীর', 'মহাবিদ্রোহ', 'টোটা', 'দাঁড়াও পথিকবর', 'ঘুম নেই', 'অজেয় ভিয়েতনাম' 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'নীল রক্ত' প্রভৃতি নাটক এবং 'দিল্লী চলো', 'মাও সে তুং', 'ভুলি নাই প্রিয়া', 'অরণ্য জাগছে', 'সমুদ্র শাসন' প্রভৃতি যাত্রাপালা আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। 'শেক্সপীয়রের সমাজচিন্তা' ও 'গিরিশ মানস' তাঁর দুটি বিখ্যাত নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর নাটকগুলি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফ্যাসিবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রেরণায় পাঠক ও দর্শকসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পরবর্তীকালে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ স্মরণীয়। ছাত্রাবস্থায় গণনাট্য সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। ১৯৬০ সালে গণনাট্য সঙ্ঘেরই একটি শাখা হিসেবে গড়ে তোলেন নান্দীকার নাট্যসঙ্ঘ। এই নাট্যসংস্থার একাধিক প্রযোজনা বাংলা থিয়েটারে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৭ সালে বিবিধ কারণে নান্দীকার থেকে বেরিয়ে এসে 'নান্দীমুখ' নামে আরো একটি নাট্যদল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্যে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সেতুবন্ধন', ব্রেখটের 'থ্রি পেনি অপেরা'-অবলম্বনে 'তিন পয়সার পালা', আর্নল্ড ওয়েস্টারের 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'-অবলম্বনে 'মাছের ঝোল আর পাউরুটি', জোশেফ কেসারলিঙের বিখ্যাত প্রহসন 'আর্সেনিক অ্যান্ড দ্য ওল্ড লেস'-অবলম্বনে 'বীতংস', 'শের আফগান' অথবা চেকভ-অবলম্বনে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' বা 'তামাকু সেবনের অপকারিতা' উল্লেখ্য।

পরবর্তী সময়ে অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে অনাদি বসু ('আলোর নিশানা', 'শপথ', 'জন্ম শতবর্ষ'), অমল রায় ('কেননা মানুষ', 'এদেশেও নর্ম্যান বেথুন', 'ইঁদুর দৌড়'), অসীম ঘোষ ('বাতিল', 'কাকলাস', 'পৌন:পুনিক') কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ('হজমশক্তি', 'স্পন্দন', 'মদিনের যুদ্ধ'), চিত্তরঞ্জন দাস (সন্ত্রাস, 'সমুদ্রের স্বাদ', 'যুদ্ধ শুরু আজ') মোহিত চট্টোপাধ্যায় ('বাইরের দরজা', 'রাক্ষস', 'সোনার চাবি', 'বর্ণবিপর্যয়', 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা'), রাধারমণ ঘোষ ('হারাধনের দশটি ছেলে', 'অহম্ আবাম বয়ম্', শ্যামলতনু দাশগুপ্ত ('যাদুকর', 'উপজিল' বিষহরি'), সুব্রত মুখোপাধ্যায় ('পিপাসা', 'কলুষ', 'চক্রব্যূহ', 'চৌহদ্দি পেরিয়ে'), দেবাশীষ মজুমদার ('ইমন কল্যাণ'), মনোজ মিত্র ('কাকচরিত্র', 'সন্ধ্যাতারা', 'আমি মদন বলছি', 'দম্পতি', 'গল্প হেকিম সাহেব'), রমাপ্রসাদ বণিক ('সহবাস', 'খেলাঘর, 'মানানসই', 'ভ্যাবলাই ভালো'), জোছন দস্তিদার ('কালোমাটির কান্না'), শৈলেশ গুহনিয়োগী ('রিহার্সাল', 'পলিটিক্স', ('গোলপার্ক'), সরোজ রায় ('গরুর গাড়ির হেডলাইট'), বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ('একটি অবাস্তব গল্প') প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন সংস্কৃত নাটক বা লোক আঙ্গিকে নাট-গীতি চর্চার ইতিহাস বাদ দিলেও ইউরোপীয় আদর্শে বাঙালির থিয়েটার চর্চারও দুশো বছর পার হয়েছে। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্রের সময় পেরিয়ে আজ বাংলা নাট্যসাহিত্য বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে নিজের মূল্য ও অবস্থান আবিষ্কারে সচেষ্ট। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায়, পরীক্ষানিরীক্ষার নতুনত্বে বাংলা

নাটকের যে ভুবনটি তৈরি হয়েছে, আগামী দিনের নাট্যকাররা তার পরিধি ও গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবেন—এমন আশা করা খুব অসমীচীন নয়।

যাত্রা :

‘যাত্রা’ শব্দটি প্রধানত যাওয়া বা গমন অর্থে বোঝায়। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে দেবদেবীর পুজো উপলক্ষে নাচ-গানবাদ্যযন্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রার প্রচলন ছিল। উৎসব বোঝাতে যাত্রা শব্দের ব্যবহার আজও প্রচলিত; যেমন দোলযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি। যাত্রা কথাটির ব্যাপক প্রচলন এবং যাত্রার সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যের যোগসূত্রই মনে হয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের কথার যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যাবে, “যাত্রায় দৃশ্যপটাদির কোন ব্যবস্থা ছিল না। সংগীত ও উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ হইত। আমাদের যাত্রায় তখন সংগীতের প্রভাব বড়ো বেশি ছিল। আর ভারতের সকল জায়গাতেই দেবলীলা কীর্তনে গীতবাদ্য দেখিতে পাওয়া যাইত, এখনও যায়।” বিভিন্ন ধর্মোৎসবে নাট্যগীত অনুষ্ঠানের দেশজ প্রচেষ্টার পরিণতি হিসেবেই যাত্রা সাহিত্যের উদ্ভব।

চর্যাপদে ‘বুদ্ধনাটক বিসমা হোই’ পদে যে নাট্যরীতির উল্লেখ আছে, তা যাত্রারই দোসর। গীতগোবিন্দ এবং প্রধানত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যেই যে প্রাচীন লোকনাট্যের রস ঘনীভূত হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই যাত্রা তথা কৃষ্ণযাত্রা নতুন রূপ নিল। ১৫০৯ সালে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে এবং পরে দ্বিতীয় শ্রীবাসের গৃহে কৃষ্ণযাত্রা যে অভিনীত হয়েছিল চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের পাতা সে কথা বলছে। এই চৈতন্যের সময় থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত যাত্রার ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়ই ছিল কৃষ্ণকথা, ‘কানু বিনে গীত নেই’। তবে পাশাপাশি এ কথাও বলা দরকার যে যাত্রার মধ্যে নাট্যাঙ্গিকের স্থূল কাঠামোটুকুই গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আসলে সাংগীতিক আবেদনেরই আস্বাদন করা হত। চৈতন্যের তিরোভাবের পর কৃষ্ণযাত্রার এই সমৃদ্ধি কমে আসতে থাকে এবং অষ্টাদশ শতকে এসে যাত্রাকে লোকরঞ্জনের একটি নিম্নমানের অনুষ্ঠান হিসেবে দেখা শুরু হল। সমাচার দর্পণ, সংবাদ প্রভাকরের মতো প্রভাবশালী সাময়িক পত্রে যাত্রাকে বর্জনের কথা, এর অনৈতিক ও ক্ষতিকর প্রভাবের কথা লেখা হল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যাত্রাকে নিন্দা করলেন।

কিন্তু যাত্রা তবু উঠে গেল না, বাংলার গ্রামাঞ্চলে আনন্দ ও ক্রমেই তা শিক্ষাদানের মাধ্যম হয়ে উঠল। নিম্নরুচির ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতা যখন গ্রাস করছিল যাত্রাকে তখন আঠারো শতকের শেষে আর উনিশ শতকের গোড়ায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা অনুযায়ী যাত্রার ‘পুনর্বিকাশ’ হয়। এই ‘পুনর্বিকাশ’-এর জন্য যাঁর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি শিশুরাম অধিকারী। ‘শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রা পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।’ শিশুরাম ছিলেন কালীয়দমন যাত্রা প্রবর্তক। শ্রীদাম ও সুবল ছিলেন শিশুরাম অধিকারীরই শিষ্য। এ সময়ে কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশি ‘বিদ্যাসুন্দর’ও যাত্রার অঙ্গনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা থেকে পরমানন্দ অধিকারীর নামও জানা যায়। পরমানন্দ বীরভূমের লোক ছিলেন। পরমানন্দ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন— ‘he used to run the whole show by acting the part of a Duti... There was not too much abundance of songs in Parma’s Yatra... At the last end or that rhymed couplets, he used to sing in the time of Kirtan... That was known as "Tukko" and Paramananda was its creator. পরমানন্দের সমসময়ে প্রেমচাঁদ বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন, জনসাধারণের কাছে 'থরকাটা প্রেমা' নামে প্রতিষ্ঠা ছিল। এই 'থরকাটা প্রেমা'র দলের 'ছোকরা' বদনের যাত্রাগান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গোবিন্দ অধিকারীর হাতে যাত্রার পালাবদল ঘটলে; তিনি নতুন রুচির সঙ্গে তাল রেখে পালা-নাটকে অঙ্কভাগ করেছেন, কিন্তু দৃশ্যভাগ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে গোবিন্দ অধিকারীর উল্লেখ আছে। ভক্তিরসের প্রসারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণযাত্রাকে নতুন ছাঁদ দিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন 'রামায়ণী কথা' অবলম্বনে 'ভরতমিলন পালা'।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশি বিদ্যাসুন্দর যাত্রাও জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ১৮২২ সালে বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন। পরে হাওড়ার ঠাকুরদাস দত্ত, ভবানীপুর বেলতলার দল, হলধরের যাত্রার দল বিদ্যাসুন্দর পালার প্রসার ঘটান। তবে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে গোপালচন্দ্র দাসের প্রযোজনায়। গোপাল তাঁর পালায় গানগুলিতে নিজে সুর দিতেন, নৃত্য পরিকল্পনাও ছিল তাঁরই। নাচের ক্ষেত্রে তিনি নতুন যে রীতি প্রবর্তন করলেন, তা অনেকটাই যেন ওড়িয়া সংস্কৃতির বঙ্গীকরণ, গোপাল নাচ ও গানকে বেঁধে একটি ব্যালে তৈরি করলেন, গোপালের বিদ্যাসুন্দর পালায় গদ্য-সংলাপের ব্যবহার ছিল না। এই গানগুলি এত জনপ্রিয় হয় যে 'গোপাল উড়ের টপ্পা' কথাটি এই সময়ে জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ' নাটকে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' গানেও তার ছায়াপাত দেখা যায়।

দুই ভাই বকু মিঞা ও সাদের মিঞা লোকযাত্রার দল গড়েন। বাগবাজারে তৈরি হয় ঝাড়ুদাস অধিকারীর দল। ১৮৭২ সালে ব্রজমোহন রায় যাত্রার দল গড়েন এবং চণ্ডীযাত্রায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সুগায়ক ব্রজমোহনের সাবিত্রী সত্যবান, অভিমন্যু বধ, কংস বধ প্রভৃতি যাত্রা যেন মহাভারতের মোড়কে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। সাংবাদিকতা ও স্বদেশ চেতনায় উনিশ শতকের আরেকটি উজ্জ্বল নাম হরিনাথ মজুমদার, যিনি কাঙাল হরিনাথ বা কাঙাল ফিকিরচাঁদ নামেও পরিচিত ছিলেন। ফিকিরচাঁদের গান ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে-গ্রামান্তরে। বাউল গানের পাশে তিনি রচনা করেন নানান পাঁচালি-নাটক-গীতাভিনয়, বিজয়া, সাবিত্রী, কৃষ্ণকালী-লীলা, কংসবধ ইত্যাদি। এই সময়ে যাত্রা বা গীতাভিনয়ে এলেন মতিলাল রায়। ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্ত করে মতিলাল যাত্রাকে ব্যবহার করলেন লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে এবং ভারতব্যাপী কিংবদন্তিতে পরিণত হল তাঁর যাত্রা। মতিলালের যাত্রার বিষয় ছিল বাল্মীকির রামায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারত। মতিলালের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বা মদন মাস্টার ও মহেশ চক্রবর্তীর এবং ধনকৃষ্ণ সেনের নাম। রসিকলাল চক্রবর্তী ১৮৮৮ সালে একদল কিশোরকে সঙ্গী করে গড়ে তোলেন—'বালক সংগীত যাত্রা' দল।

বিশ শতকে যাত্রার বিষয়ে এল পরিবর্তন এবং এ পরিবর্তন অবশ্যই সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিজাত। উনিশ শতকীয় রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দর পালার ধারাটির পাশে এল কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র। ধার্মিক পৌরাণিক পালার বদলে চারপাশের মানুষজনই হয়ে উঠতে লাগল যাত্রার চরিত্র। এ বিষয়ে পথ দেখালেন মুকুন্দদাস। তিনিই স্বদেশিয়ানায় ভরিয়ে তুললেন গ্রামবাংলার যাত্রামঞ্চ। তাঁর প্রথম যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা' থেকেই পড়ে গেলেন রাজরোষে। স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর মহাজন হয়ে উঠল তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। গানের সঙ্গে

বক্তৃতা মিশে এক নতুন রূপ নিল চারণকবি মুকুন্দদাসের রচনা। মুকুন্দদাসের দেখানো পথ অনুসরণ করলেন মথুর সাহা আর ভূষণ দাস। সমসময় অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ধর্মদাস রায়, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখেরা যাত্রাপালায় নতুন ভাবনা ও রূপের প্রকাশ ঘটালেন। এঁদের পাশাপাশি আরেকটি উজ্জ্বল নাম ব্রজেন্দ্রকুমার দে। ব্রজেন্দ্রকুমার প্রথম দিকে অনুসরণ করতেন তাঁর পূর্বসুরী ভোলানাথ রায়কে। যাত্রাপালায় পুরাণের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৪৪ সালে মন্বন্তরের পটভূমিকায় লিখলেন 'আকালের দেশ', এ পালায় ঐক্যবন্ধ কৃষকশক্তির কাছে হার মানে রাজক্ষমতা। ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লিখলেন 'শেষ নমাজ' (যে পালা বিখ্যাত হয় 'বাঙালি' নামে), প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লিখলেন 'ধর্মের বলি', 'গাঁয়ের মেয়ে', 'চাঁদবিবি' এবং ময়মনসিংহ গীতিকার আখ্যান অনুসারে 'সোনাই দিঘি'। সোনাই চরিত্রে জ্যোৎস্না দত্ত-র অভিনয়সূত্রে যাত্রায় প্রথম মহিলা শিল্পীর অংশগ্রহণ। এই যাত্রাপথেই নারীচরিত্রে পুরুষ অভিনেতার দল বিদায় নিল। তাঁর 'নটী বিনোদিনী'তে নামচরিত্রে অভিনয় করতে এসে খ্যাতির শিখরে পৌঁছোলেন বীণা দাশগুপ্তা।

১৯৬১ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা-উৎসব যাত্রার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা, কারণ শহুরে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যাত্রাশিল্প, শহরেও বসতে লাগল যাত্রার আসর, আর যাত্রার বিষয়ে ও রূপেও পড়ল নাগরিক প্রভাব। যাত্রাশিল্পে সিনেমা ও থিয়েটারের জনপ্রিয় শিল্পীদের আগমন ঘটতে লাগল। সংবাদপত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাত্রা হয়ে উঠল জনপ্রিয়। প্রকরণের ক্ষেত্রে এল সিনেমা ও নাটকের নানা কৌশল। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও যুগের চাহিদাকে প্রয়োগ করলেন পালাকারেরা। এর ফলে মঞ্চে এলেন হিটলার, লেনিন, সুভাষচন্দ্র; এল কৃষক আন্দোলনের কথা, এল ভিয়েতনাম কিংবা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

১৯৬৭-র নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত জাঁকজমকহীন মঞ্চে নিয়ে এলেন তাঁর পালা 'রাইফেল' ত্রিশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিষয় করে। এরপর 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' এবং 'অরণ্যের ঘুম ভাঙছে' পরাধীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে লিখিত আর মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত পালা 'সন্ন্যাসীর তরবারি'।

ছয়ের দশকে ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা' তাঁকে যাত্রা ইতিহাসে স্মরণীয় করে দেয়। শ্রমিক, মিলমালিক, জমিদার, উচ্চ-নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার, শেক্সপিয়র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতার ব্যবহার—সব মিলিয়ে নতুনত্বের ছোঁয়াচ লাগে যাত্রাপালায়। সাতের দশকে তাঁর 'মা মাটি মানুষ' পালায় নায়কের মর্যাদা পেল নিরক্ষর চাষি, পরের পালা 'অচল পয়সা'তেও রয়েছে গ্রামজীবনের ছবি।

সাতের দশকের শেষের দিকে এলেন শম্ভুনাথ বাগ। তাঁর পালায় একদিকে যেমন আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব, আর্যদের ক্ষমতালিপ্সা ও অত্যাচারের ছবি, অন্যদিকে রুশ-জার্মান লড়াইয়ের পটভূমিকায় 'হিটলার', আবার কখনও 'মহেঞ্জোদাড়ো' কখনও বা 'লেনিন', পাশাপাশি 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা', জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে 'জ্বালা' তাঁর বিখ্যাত পালা।

এইভাবেই যাত্রাশিল্প বারবার বাঁক নিয়েছে বিষয়ে আর প্রকরণে। নিখাদ গ্রামীণ যাত্রার রূপটি আজ বর্ণবহুল আর ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তবে এই গৌরব কতটা নিজস্ব আর কতটা ধার করা, মেকি তা আলোচনার বিষয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর খেদোক্তি তাই স্মরণীয়, 'যাত্রার দুর্ভাগ্য বাংলা থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছে।' অবশ্য এই পরিবর্তন সর্বস্তরেই, শুধু যাত্রাকে আলাদা করে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবে এ কথা ঠিক যে জ্যোতিভূষণ চাকীর 'যাত্রা হবে রাতে' কবিতাটির ছবি আজ আর সহজপ্রাপ্য নয় :

শুনছ কি গো চণ্ডীতলা যাত্রা হবে রাতে,
ছেলের দল মেরাপ বাঁধে হাত মিলিয়ে হাতে।
বাক্স প্যাঁটরা বাদ্য ভাণ্ড একখানে সব পড়ে
নটের দল নতুন গাঁয়ে এদিক ওদিক ঘোরে।
কেউ করছে সিঁথি পাটি, কেউ চিবুচ্ছে আঁক।
কেউ বা গেছে পুকুরঘাটে, কেউ করছে পাক।
অধিকারী টানছে হুঁকো মাঝে মধ্যে কাসি,
হঠাৎ শুনি হা-হা-হা-হা মইষাসুরের হাসি।
মাচার ওপর ছোট্ট দোকান চলছে বিকিকিনি,
রাতের বেলা যাত্রা হবে মহিষমর্দিনী।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা—উপন্যাস ও ছোটোগল্প :

যে-কোনো কালপর্ব বা সময়কে আমরা সমুদ্র এবং তার ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আর সাহিত্যের নানা শাখা সেই ঢেউয়ের উপরে ভাসমান খেয়ার মতো, দোলা খেয়ে অগ্রসর হয়, কখনও পথ হারায়; আবার কখনও সময়ের ঝড়-তুফানকে অতিক্রম করে, নিজের দিশা ঠিক রেখে কালোত্তীর্ণ বেলাভূমিতে চিরদিনের জন্য নোঙর ফেলে। উনিশ শতককে আমরা এমনই এক তরঙ্গে-আকুল সমুদ্র হিসেবে কল্পনা করতে পারি। সেটা ছিল প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এবং পরে ইংরেজ রাজতন্ত্রের আমল। মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থার সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার অস্ফুট বিরোধের আভাস যেমন পাওয়া যাচ্ছিল, তেমনই ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি (শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি)—তৎকালীন সমাজ, সামাজিক ভণ্ডামি, ইংরেজ রাজতন্ত্রের অসংগতি, নব্য বাবুদের ব্যক্তিজীবনের মাত্রাহীনতা, কুরুচি, নৃত্য-গীত চর্চা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নীতিহীনতা, ব্যক্তিজীবনের স্ববিরোধ এসমস্ত কিছুকে সম্বল করে; বাংলা গদ্যসাহিত্যে নকশা জাতীয় লেখালেখির মধ্যে দিয়ে সমাজজীবন এবং মনুষ্যচরিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল। এগুলিকে আমরা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত রচনা হিসেবে উল্লেখ করে আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি।

উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত রচনা :

১৮৫২ সালে 'The Last Day of the Week' নামক একটি ইংরাজি আখ্যানের ছায়া অনুসারে হানা ক্যাথেরিন ম্যুলেন্স নামের এক বিদেশিনী বাংলা ভাষা শিখে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনা করেন। এটি একটি খ্রিস্টান পরিবারের ঘটনা। এই রচনাটির ভাষা সাধু হলেও সরস। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি একটি বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে লিখিত আখ্যান। শুধু এর চরিত্রেরা বাঙালি এবং গল্প রচনায় লেখিকার মুন্সিয়ানার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে 'প্যারীচাঁদ মিত্র' বা 'টেকচাঁদ ঠাকুর'-এর ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' হল প্রথম মৌলিক রচনা, যেখানে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্প পরিবেশন করার চেষ্টা করা হল। এটির ভাষা সাধু হলেও তুলনায় সহজ ও বোধগম্য। তিনি তদ্ভব ও দেশি শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী থাকায় গদ্যের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হল। 'রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বলদেরা গোরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে'—এর থেকেই বোঝা যায় তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে চলতি কথ্য বুলির কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'মদ খাওয়া বড়ো দায়, জাত রাখার কি উপায়' নামক বইটির

উপদেশমূলক কাহিনিতে ছোটোগল্পের অস্ফুট সম্ভাবনাও শোনা যায়। আর প্যারীচাঁদের এই ধারারই সার্থক উত্তরসূরী হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রবন্ধ পর্যায়ভুক্ত তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১-৬২ সাল) চলিতে লেখা 'শীত কালের রাত্তির শীগ্‌গির যায় না, অ্যাক ঘুম, দুঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাক ঘুম হয়;'—এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার, উচ্চারণরীতি—এ সবেতেই চলিত বাংলার প্রাঞ্জল ও পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটল। 'সামাজিক ছবি আর ব্যক্তি বিশেষকে বিদ্রূপ, দুই নিয়ে হুতোমের নক্‌শা'[৫]—এরসঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখায় যেমন বাস্তবতা, কাহিনিগুণ, প্রাণবন্ত ভাষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হল, ঠিক তেমনই হুতোম আনলেন শালীনতা, চিত্রময়তা এবং বাঙালিয়ানা। এই সময়েই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭ সাল) ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' (১৮৫৬ সাল) বই দুটিতে ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাল্পনিক কাহিনির বিস্তারে, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত আরও দুটি রচনা প্রকাশিত হল।

এখন পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার আগে খুব সংক্ষেপে উপন্যাস ও ছোটোগল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটুকু স্পষ্ট করে জেনে নেওয়া যাক। উপন্যাস মূলত গদ্যে রচিত হয়, বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে; ব্যক্তিমানুষের মনের বিভিন্ন স্তর এবং স্বাতন্ত্র্যের উন্মোচনের মাধ্যমে নিজের প্রতিপাদ্যে পৌঁছায়। অন্যদিকে ছোটোগল্প সংহত আয়তনের মধ্যে জীবনের কোনো এক খণ্ড মুহূর্তকে তুলে ধরে। তার প্রতিপাদ্য নেই, নগ্ন জীবনজিজ্ঞাসা আছে। এখানে বলা দরকার, উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশের ফলেই ছোটোগল্পের আবির্ভাব হয়। বিদেশি সাহিত্যেও তাই ঘটেছে, আর বিদেশি সাহিত্যের আদলে বাংলাতেও তাই ঘটেছে। তবে পরবর্তীকালে উপন্যাস ও ছোটোগল্পে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেক বদল ঘটেছে। সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই এবং আমরা এখন যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সেই স্তরের জন্য এই স্বচ্ছ প্রাথমিক ধারণাটুকুই আবশ্যিক।

সুতরাং, উপন্যাসের সেই জন্ম-লগ্নে ম্যুলেন্সের পারিবারিক আখ্যান, প্যারীচাঁদের আলাল, তারও আগে ভবানীচরণের নকশাজাতীয় লেখা, হুতোমের নকশা, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ইতিহাসাশ্রিত কাহিনি বিভিন্নভাবে বাংলা সৃষ্টিশীল গদ্য তথা উপন্যাসের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। বিশেষত, প্যারীচাঁদ ও হুতোমি গদ্যের বিদ্রূপাত্মক ছাঁদ অনেক পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এই পটভূমিকার সফল ও সামগ্রিক বিকাশ ঘটল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, তিনিই বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। বাংলা উপন্যাসের শাপমুক্তি ঘটল তাঁর হাতে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক বাংলা উপন্যাস :

পাশ্চাত্য তথা ইংরাজি সাহিত্যের অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে স্যার ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ডিকেন্স প্রমুখের লেখা পাঠ করেছিলেন। এছাড়াও পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত রচনার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের গঠনকৌশল, চরিত্র নির্মাণ, ঘটনাপরম্পরা এবং জীবনবোধের বিশিষ্টতায়, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক এবং বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত। তাই ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির চিত্তমুক্তি ঘটল। এমন লেখা তৎকালের বাঙালি আগে পড়েননি। যে বিশুদ্ধ রোমান্সের সৃষ্টি হল জগৎসিংহ-আয়েষা-তিলোত্তমার প্রণয়কাহিনিকে কেন্দ্র করে তা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। এর ঠিক পরের বছর ১৮৬৬ সালে তিনি লিখলেন 'কপালকুণ্ডলা'। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের যাবতীয় ত্রুটি ও জড়তাকে অতিক্রম করে লেখক বঙ্কিম কল্পনাশক্তির অনন্যতায় এবং রচনাশৈলীর নৈপুণ্যে বাংলা সাহিত্যের এক চিরস্থায়ী কীর্তির জন্ম

দিলেন। প্রকৃতিকন্যা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পথভ্রষ্ট নবকুমারের গভীর জঙ্গলে সাক্ষাৎ, নবকুমারের প্রণয়, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, নিয়তিনির্দিষ্ট মৃত্যু পরিণামের ট্র্যাজিক প্রকাশ এক আশ্চর্য নাটকীয় চমৎকারিত্ব এবং কবিত্বশক্তির সংশ্লেষে প্রকাশিত হল। মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যভাগ্যের অন্তর্লীন বিরোধ-টানাপোড়েনের ফসল কপালকুণ্ডলা; লেখকের এক অনন্য সৃষ্টি। এইভাবে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম কোনো একটি ঐতিহাসিক সময়ের পটভূমিতে বিভিন্ন উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের প্রতিস্থাপিত করে কল্পনা ও রোমান্সের সংমিশ্রণে একে একে ‘মৃণালিনী’, ‘যুগলাঙ্গুরীয়’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাজসিংহ’, ‘সীতারাম’ প্রভৃতি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলি লিখে গেছেন। এদের মধ্যে ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাজসিংহ’ ও ‘সীতারাম’ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এছাড়াও ‘বিষবৃক্ষ’, ‘রজনী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর মতো কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসগুলি ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাসের দিক্‌নির্দেশ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। এই তিনটি উপন্যাসেরই প্রেক্ষিত ছিল সমসাময়িক পারিবারিক জীবন। ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসেও অবৈধ প্রেমসম্পর্কের বিষয় ছিল; কিন্তু ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নরনারীর অবৈধ প্রণয়-কামনা-অসংযত-মানসিক দ্বন্দ্ব-রক্তক্ষরণ-সর্বোপরি ট্র্যাজিক পরিণাম তাঁকে ঔপন্যাসিক সিদ্ধির চূড়ায় নিয়ে যায়। যদিও লেখক বঙ্কিমের আদর্শবাদিতা ও নীতিবোধের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিল। তবে নরনারীর জীবন এবং মনোজগত সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির কারণেই তাঁর সৃষ্ট কুন্দ-গোবিন্দলাল-রোহিণী-নবকুমারদের আবেদন বাঙালি পাঠকের কাছে আজও অমলিন।

পরিশেষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটির কথা ঐতিহাসিক কারণে আলাদাভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা, পরাধীন দেশে বহু তরুণ-যুবক এই উপন্যাসটি পড়েই স্বদেশিকতা এবং জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণ এবং সৌন্দর্যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে যে স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন; তার সমসময়ে কিংবা অল্প কিছুদিন পরেও বাংলা উপন্যাসে তিনিই হয়ে রইলেন অদ্বিতীয়। তবে একথাও ঠিক, এমন কয়েকজন শক্তিশালী লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁদের সম্পর্কে না জানলে আমাদের আলোচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইতিহাস-আশ্রিত এবং সামাজিক, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত এই দুই খাতেই বাংলা উপন্যাস প্রবাহিত হল। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’, রমেশচন্দ্র দত্তের ‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ ও ‘রাজপুত জীবন সন্ধ্যা’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’ এবং ‘কাঞ্চন মালা’, স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘মিবার রাজ’ ও ‘বিদ্রোহ’ আর মীর মশার্‌ফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’ ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস হিসেবে রচনাকারদের মৌলিকতায় সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া সামাজিক উপন্যাস হিসেবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’, শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘যুগান্তর’, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ‘শ্রীরাজলক্ষ্মী’ প্রভৃতি লেখাগুলি সুখপাঠ্য এবং উনিশ শতকীয় সমাজজীবন এবং ব্যক্তিমানসের ভাবদ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।

এখানে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘পালামৌ’-এর কথা আলাদাভাবে বলা উচিত। যদিও এটি উপন্যাস নয়, ভ্রমণ কাহিনি। কিন্তু তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ বিষয়ক অতি উপভোগ্য, গদ্য সাহিত্যের একটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সময়ের গদ্য সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কৌতুক গল্পের জন্ম। প্যারীচাঁদ এবং হুতোমের নক্‌শার যে ধারার সূচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের’ কয়েকটি রচনায় যার বিস্তার এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর লেখনীতে যার পুষ্টি, তাঁদেরই সমসাময়িক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হল। তাঁর ‘কঙ্কাবতী’, ‘ফোকলা দিগম্বর’ নামক উপন্যাসগুলির বদলে ‘ভূত ও মানুষ’, ‘মুক্তমালা’, ‘ডমরু রচিত’ প্রভৃতি গল্পগুলি আজও আমাদেরকে একইরকম আনন্দ দেয়। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে বাঙালির পুরনো বৈঠকী গল্পের মেজাজ, বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক তাঁকে সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে একদিকে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদিকে ত্রৈলোক্যনাথ এই দু’জনের হাতেই বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের জন্ম হল। পরবর্তীতে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মধ্যে যে শিথিলতা ছিল তাকে আরও নিপুণ করলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। একটা পারিবারিক আবহের রূপ দিলেন তিনি। আমাদের চারপাশের বৈসাদৃশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুললেন বিভিন্ন কৌতুক গল্প। প্রায় সমসময়েই ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারী দেবী বাঙালি নারীমনকে কেন্দ্র করে গল্প লিখতে শুরু করলেন। মেয়েদের লেখা বাংলা ছোটোগল্পে তিনিই পুরোধা। তাঁর ‘যমুনা’, ‘গহনা’, ‘কেন’ প্রভৃতি গল্পে মেয়েদের পুরুষকেন্দ্রিক জীবন এবং পারিবারিক অবহেলার নানান বিষাদ-করুণ ছবি ফুটে উঠল। এরপর সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, শান্তা দেবী হয়ে সীতা দেবী পর্যন্ত বারে বারে ব্যর্থপ্রেম, পুরুষের এবং পরিবারে অবহেলার কথা ফিরে ফিরে এসে বাংলা লেখিকাদের ছোটোগল্পকে পুনরাবৃত্তির চোরাবালিতে আটকে রেখেছিল। অনেক পরে, তা থেকে মুক্তি ঘটেছিল আশাপূর্ণা দেবীদের হাতে। বহু লেখকের সমাগমে বাংলা উপন্যাস যেমন লেখা হতে থাকল, তেমনই বাংলা ছোটোগল্পেরও আত্মপ্রকাশ ঘটল। কিন্তু বাংলা উপন্যাস ও গল্পকে এই অগভীর গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিংশ শতকের গোড়ায় তিনি বঙ্কিম প্রভাবিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা উপন্যাসের বাঁকবদল ঘটালেন।

ঔপন্যাসিক এবং ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও সমকাল :

প্রথমদিকে রোমান্স লিখলেও (‘রাজর্ষি’, ‘বউঠাকুরানীর হাট’) লেখক রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ প্রকাশিত হল ১৯০৩ সালে। এই উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে তার জৈবনিক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে তিনি যে নিরাসক্তি ও বাস্তববাদিতার পরিচয় দিলেন তা বাংলা উপন্যাসকে বঙ্কিমপ্রভাব মুক্ত করে বিশ শতকীয় ‘চোখের বালি’ কে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। কিন্তু ‘গোরা’ (১৯১০) উপন্যাস থেকে শুর হল আরেক নতুন অধ্যায়। সমাজ-পরিবার-ব্যক্তির আন্তরসম্পর্ককে তিনি স্বদেশের মহাকাব্যিক পটভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করে রাজনীতি, সমাজ সংস্কার এবং স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিকে ব্যক্তির ভূমিকা ও অবস্থান অনুসন্ধানে রত হলেন। সেই সময়ের (বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী বাংলা) উত্তাল সমাজ-রাজনৈতিক আবহে পরবর্তীকালে একে একে ‘ঘরে বাইরে’, ‘চার অধ্যায়’-এর মতো উপন্যাসেও সমাজ ও দেশের নিরিখে ব্যক্তির আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মানুসন্ধানে ব্যপৃত থেকেছেন। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের উত্তর পর্বের উপন্যাসগুলিতে তত্ত্বচিন্তা, মননশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, ইঙ্গিতময়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখনীকে বিশেষ বৈচিত্র্য দিয়েছিল; এর সঙ্গে কবিতা আত্মকথা প্রভৃতি ধরনের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল এক নতুন শৈলীর। ‘চতুরঙ্গ’, ‘যোগাযোগ’ প্রভৃতি উপন্যাসের পরে ‘শেষের কবিতা’য় গদ্য-পদ্যের এক বিস্ময়কর মেলবন্ধন ঘটিয়ে মানবীয় প্রেম-সম্পর্ককে তিনি এক অতুলনীয় ঐশ্বর্য দিলেন। তাই বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র উপন্যাসধারা বাংলা উপন্যাসকে দিল আধুনিক মনোভঙ্গি, ভাষার ঐশ্বর্য এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিচিত্র সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার বলিষ্ঠ সাহস।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে আগেই ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি। ১৮৯১ সালে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর আরম্ভ, ১৯৪০ সালে ‘তিনসঙ্গী’র তিনটি গল্প দিয়ে তাঁর যাত্রাপথের সমাপ্তি। এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে তিনি বিচিত্র বিষয়ে অজস্র গল্প লিখেছিলেন। সেখানে ‘কঙ্কাল’, ‘শাস্তি’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘ছুটি’-র মতো গল্প যেমন আছে, তেমনই ‘স্ত্রীর পত্র’ কিংবা ‘ল্যাবরেটরী’র মতো লেখাও আছে। এখানে বলা প্রয়োজন রবীন্দ্র উপন্যাসের জগতের থেকে রবীন্দ্র ছোটোগল্পের জগৎ আলাদা। সেখানে বোবা মেয়ে, নি:সঙ্গ পোস্টমাস্টার, অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ, নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে উন্মাদ মেহের আলি, মৃত্যুঞ্জয় মুদি, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়ারের মতো কতো ধরনের মানুষের আনাগোনা। তাদের রহস্যময় মন, মনের জটিলতা আর গ্রাম-বাংলার পল্লী প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য। এই সবকিছুর আশ্চর্য রসায়নে তাঁর প্রথমদিকের প্রায় প্রতিটি গল্পের রস ও স্বাদ অভিনব এবং পরস্পরের থেকে আলাদা। পরে ‘হালদার গোষ্ঠী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘রবিবার’ ‘ল্যাবরেটরী’র মতো মনন-প্রধান গল্পে তিনি আধুনিক মানব জীবনের সমস্যা আর মানুষের অন্তর্মনের জটিলতার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তাই সামগ্রিক বিচারে একথা বলাই যায় তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটোগল্পে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। মানব হৃদয়ের গভীরতাকে তিনি যে অনায়াস দক্ষতায় স্পর্শ করেছিলেন, তাতে তাঁকে বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পকারের সঙ্গে একাসনে বসানো যায়।

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, বাংলায় বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক গল্পের যে ধারা ত্রৈলোক্যনাথের হাতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে সার্থকতা লাভ করল। তিনি ‘নবীন সন্ন্যাসী’, ‘রত্নদীপ’, ‘মনের মানুষ’, ‘আরতি’-র মতো বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখলেও; তার প্রকৃত সাফল্য লুকিয়ে ছোটোগল্পে। ‘দেবী’, ‘আদরিণী’র মতো অসাধারণ ভাবগভীর গল্প লিখলেও তাঁর ‘বলবান জামাতা’, ‘মাস্টার মহাশয়’, ‘রসময়ীর রসিকতা’র মতো কৌতুক কাহিনিগুলি সহজ, মার্জিত এবং নির্মল হাস্যরসে ভরা। এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গেলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌতুক-ব্যঙ্গের সমাহারে বহুধা বিচিত্র গল্প লিখলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ বসুরা। আর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শাণিত কৌতুক-কটাক্ষের পরিচয় পাওয়া গেল প্রমথ চৌধুরীর নীললোহিত সম্পর্কে লেখা গল্পগুলিতে।

আর অন্যদিকে উপন্যাসে রবীন্দ্র-বঙ্কিম প্রবর্তিত পথের অক্ষম-তরলীকৃত অনুকরণে প্রচেষ্টা দেখা গেল, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নিরূপমা দেবী, অনুরূপ দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাসে। একমাত্র পরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ‘অভয়ের বিয়ে’, ‘শুভ্রা’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলি ছিল মৌলিক ও ব্যতিক্রমী। এই সময়কালেই বাংলা উপন্যাসে এক সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক অভিঘাত সৃষ্টি করলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যসাহিত্য ও সমকালীন উপন্যাস-ছোটোগল্প :

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-আত্মজিজ্ঞাসা আর সমাজ ও স্বদেশ ভাবনার আদর্শ, গড়পড়তা বাঙালি পাঠকের মন স্পর্শ করতে পারছিল না। এছাড়া অন্য কারো পক্ষে তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। ঠিক সেই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী বাঙালি মনকে জয় করল। তাঁর লেখায় সমাজ অননুমোদিত প্রেম আর সামাজিক গোঁড়ামির প্রতি তীব্র কটাক্ষ নতুনরীতিতে প্রতিফলিত হল।

বাংলা উপন্যাসকে এক নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ উপন্যাস। লেখক শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল এই লেখা। এর ঠিক দশ বছর পরে ‘বড়দিদি’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ।

এরপর তিনি একে একে ‘বিরাজ বউ’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘পল্লিসমাজ’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘চরিত্রহীন’, ‘বামুনের মেয়ে’, ‘গৃহদাহ’, ‘দেনাপাওনা’, ‘পথের দাবী’ থেকে ‘বিপ্রদাস’ পর্যন্ত নানা ধরনের তিরিশটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী চরিত্রগুলি মাতৃত্বময়ী। বাঙালি পরিবারের কেন্দ্রে আসীন যে নারী শতদহন সহ্য করেও সমস্ত কিছু ধারণ করে রাখে, শরৎচন্দ্র বাঙালির মনোভূমির সেই নারীকেই বার বার আবিষ্কার করেছেন। এক্ষেত্রে অচলা, যোড়শী, কিরণময়ীরা বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য হতে পারে। আর শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রেরা উদাসীন, সৃষ্টিছাড়া, স্নেহের কাঙাল এবং নিজ পৌরুষের পরিবর্তে পরের উপর নির্ভরশীল। যার সঙ্গে খাঁটি বাঙালির পুরুষের সামঞ্জস্যও অনস্বীকার্য। তিনি একদিকে স্বার্থপর, কূট মানুষদের সঙ্গে সরল, উদার, প্রাণময় ও পরোপকারী লোকেদের সংমিশ্রণে যে গ্রামীণ জীবনের ছবি আঁকলেন তাও বাংলার গ্রামজীবনের কাছাকাছি। এই ছবি আঁকতে গিয়ে গ্রামের অপমান, অত্যাচার, স্বার্থপরতা, জমিদারতন্ত্রের শোষণকে তিনি যেমন বেআব্রু করলেন, তেমনই অসহায়, নিষ্পেষিত মানুষের প্রতি তাঁর অশ্রুসজল মমত্ব, সহানুভূতি ও গভীর ভালোবাসার বোধ তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলল। তাই যে বাঙালি বুক দিয়ে ‘বঙ্গভঙ্গ’ রোধ করল, সে শরৎবাবুর উপন্যাসে খুঁজে পেল শতছিদ্র যৌথ সংসারের অক্ষুণ্ণ অটুট অবস্থা। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম চাষা, চাকর, মিস্ত্রি, নায়েব, স্ত্রীলোক তাঁদের সত্যিকারের ভাষায় কথা বলে উঠল। এই জীবন্ত ভাষা উপন্যাসকে দিল গতিশীলতা ও আবেগ। এই প্রাঞ্জল গদ্যরীতি এবং মমতায় আচ্ছন্ন জীবনবোধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিল। এমন জনপ্রিয়তা আর কোনও বাঙালি গদ্যলেখকের কপালে জোটেনি।

ছোটোগল্পকার শরৎচন্দ্রের মধ্যেও আমরা এই একই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ দেখি। তাঁর ‘মহেশ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘লালু’ প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। এখানেও গ্রামের অসহায়, নিরন্ন, প্রান্তিক মানুষের দুর্দশা ও লাঞ্ছনাকে তিনি গভীর মমতা সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানবিক অনুভূতিকে সহজেই প্রকাশ করার এক আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তাঁর সহজাত। আর এ প্রসঙ্গে তাঁর রসবোধ অনুভূতিকে সহজেই প্রকাশ করার এক আশ্চর্য দক্ষতা ছিল তাঁর সহজাত। আর এ প্রসঙ্গে তাঁর রসবোধ ও হিউমার সেন্সের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়, শ্রীকান্ত থেকে লালুর গল্পে এবং বিভিন্ন লেখায় তা ছড়িয়ে আছে, যা শরৎসাহিত্যকে এক অতুলনীয় বিশিষ্টতা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কারণেই শরৎচন্দ্র উপন্যাস ও গল্পকে আপামর মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রাণের সম্পদে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরে আমরা আবার উপন্যাসের বাঁকবদল ঘটতে দেখব বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে। কিন্তু তার আগে ওই পর্বের দুজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের (রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র) দুজন নায়ককে আমরা পেলাম। অমিত রায় (শেষের কবিতা) ও শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত ভবঘুরে আর অমিতের মধ্যেও বাউন্ডুলেপনা আছে। তারা দুজনেই ‘বাঙালি মধ্যবিত্তের পতনের যুগের নায়ক’[৬]। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনতাকামী বাঙালি নানাভাবে প্রতিবাদ করেছে, পাল্টাতে চেয়েছে, কিন্তু দেশ ও সমাজের ক্রমক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় তারা আরও জর্জরিত হয়েছে। অমিত ও শ্রীকান্তের ভাষ্যে কোথাও একটা এই একাকীত্ব এবং ব্যর্থতার বোধ উঁকি দিয়ে যায়। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি’ উপন্যাস, সাবলীলভাবে এই ব্যর্থতার গ্লানিকে অতিক্রম করে যায়, অপু-দুর্গা নামক দুটি বালক-বালিকার বড়ো হয়ে ওঠায়, তাদের বেঁচে থাকায়; এবং জীবনের প্রতি মৌলিক কৌতূহলে।

বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপন্যাস ও ছোটোগল্প :

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি’ বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-হরিহর-ইন্দির ঠাকরুনদের নিয়ে গড়া এই উপন্যাসের জগৎ এক মানবীয় সমগ্রতায় পূর্ণ।

এরপর তিনি 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'কিন্নরদল' প্রভৃতি উপন্যাস লিখেছেন। বিভূতিভূষণের লেখায় প্রকৃতি ও মানুষ কখনও অচ্ছেদ্য, কখনও প্রকৃতিরই সম্প্রসারণ। তাঁর উপন্যাসে সহজ, সাধারণ, অন্ত্যজ মানুষের ভিড়। তিনি কোথাও যেন তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করেন না। জীবনের স্বত:স্ফূর্ত ছন্দেই তারা এমন রূপ লাভ করে। অন্যদিকে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার জগৎ মহাকাব্যিক বিপুলতায় গড়া। শ্রেণির, নানা গোত্রের, নানা স্বভাবের মানুষ সেখানে ভিড় করে। বোষ্টম-বোষ্টমী, খুনী, আসামী, বেদে, কামার, রাঢ় বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় তাঁর লেখার উপাদানে পরিণত হয়। এইসঙ্গে বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমের ভূপ্রকৃতি এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পরিবর্তমান ইতিহাসও যেন তারাশঙ্করের সাহিত্যে একটি চরিত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনি', 'কবি', 'পঞ্চগ্রাম', 'সন্দীপন', 'পাঠশালা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে এবং অজস্র ছোটোগল্পে কোনও ব্যক্তি মানুষ বা সম্প্রদায় বা সমাজের নিরিখে, পটবদলের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও ইতিহাসের রূপান্তরকে খনন করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। আবার লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট সাহিত্যে স্পষ্ট দুটি পৃথক অধ্যায় পরিলক্ষিত হয়। প্রথম জীবনে মানবমনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মসমীক্ষা এবং দ্বিতীয় পর্বে কমিউনিস্ট দলের সদস্য পদ নেওয়ার পরে মার্কসীয় ভাবদর্শের নিরিখে বিপ্লবী রোমান্টিক দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা। 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'অহিংসা', 'চতুষ্কোণ', 'চিহ্ন', 'আরোগ্য' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি হল এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ফসল। পুরুষ ও নারীর প্রবৃত্তি, মনোবিকার, রক্ত-মাংসের উত্তাপ, মানসিক অসঙ্গতি, যৌনতা, মতাদর্শ, রোম্যান্টিকতা এই সব বিষয়কে তাঁর চরিত্রেরা কখনও সংঘর্ষের মাধ্যমে আবার কখনও বিশ্লেষণের সাহায্যে যেন স্পর্শ করতে চায়। ভারত ইতিহাসের পর্বান্তর ও পরিবর্তমান মূল্যবোধকে তুলে ধরার পেছনে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সদাসচেষ্ট ছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন বিষয় বা আঙ্গিকের দিক থেকে না হলেও তাঁর অসামান্য গদ্যশৈলীর গুণে তিনি পরবর্তীকালের বাংলা ঔপন্যাসিকদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

আবার এই কালপর্বেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহনা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' এবং গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'-এর (ত্রিদিবা) মতো উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষের নিজেকে খুঁজে ফেরার যে নিরলস অনি:শেষ প্রয়াস; ব্যক্তিমনের চৈতন্যস্রোত, নব নব শিল্পমাত্রা নিয়ে প্রকাশিত হল। এরপর চারের দশকে ঔপন্যাসিক কৃতিত্বে সতীনাথ ভাদুড়ির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'জাগরী'র মতো রাজনৈতিক উপন্যাসে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রে একটি পরিবারের কাহিনি পরিস্ফুট হয়েছে। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে ঢোঁড়াইয়ের মতো অন্ত্যজ শ্রমজীবী মানুষের জীবন, সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, আচার, পৌরাণিকতা সমেত ভারতীয় বাস্তবতার এক বিরাট পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা এক মহাকাব্যিক নায়কের সন্ধান পাই। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সংঘর্ষরত ঢোঁড়াই যেমন নিজেকে আবিষ্কার করে, তেমনই নিজেকে আবিষ্কার করার ফলে সে বাইরের স্বরূপটাকেও খুঁজে পায়।

আর আমাদের আলোচিত এই পর্বে বাংলা ছোটোগল্প বিপুল সম্ভাবনার বহুমাত্রিক পথে প্রবাহিত হল। বাংলা কৌতুক গল্পের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল ত্রৈলোক্যনাথের হাতে, বহুস্তর অতিক্রম করে তা আরও বিশিষ্ট ও মার্জিত হয়ে দেখা দিল পরশুরাম বা রাজশেখর বসুর লেখায়। তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ধুস্তরী মায়া' প্রভৃতি গল্প সঙ্কলনগুলিতে দার্শনিকতা, যুক্তিবাদ এবং বুদ্ধিদীপ্ত তির্যক কটাক্ষে সংমিশ্রণ তাঁকে

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। এরপর এই নাগরিক মার্জিত কৌতুক নানাভাবে পল্লবিত হল রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনফুল, সজনীকান্ত দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখের লেখায়। 'রানুর' ঘরোয়া গল্পকে কেন্দ্র করে নির্মল হাস্যরসের জোগান দিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য উত্তরসূরী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সূক্ষ্ম কৌতুক ও বৈদগ্ধ্যে আসর মাতালেন পরিমল গোস্বামী, সৈয়দ মুজতবা আলি। পরবর্তীতে গৌরকিশোর ঘোষ, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখেরা কথার কারসাজিতে রস-ব্যঙ্গ সৃষ্টির বিচিত্র পন্থায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন।

অন্যদিকে গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর 'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর', 'মৃত্তিকা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে, চরিত্রনির্মাণে, সূক্ষ্মতায় এবং গূঢ় সাঙ্কেতিকতায় অনবদ্য। জীবনের বিষাদময়তাকে তিনি আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেন। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্তরা মানুষের অন্তর্মনের যৌনতা, ক্রূরতা, লোভ, কামনা বাসনা প্রভৃতি জৈবিক শক্তির ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে মানব জীবনের নিয়তি ও অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণ দেখিয়ে পাঠককে বিমূঢ় করেছেন। তাঁদের 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'গতিহারা জাহ্নবী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে আমরা এসবরেই প্রতিফলন দেখি। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্প মতাদর্শগত কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল' প্রভৃতি গল্পগুলিতেও আমরা জীবনের আপাত-সুন্দর রূপের ভেতরেও যে কদর্য-কুশ্রীতা ও পাপ প্রচ্ছন্ন থাকে তা আবিষ্কৃত হতে দেখি। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর লেখালিখি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।

এছাড়া বিষয়ের অভিনবত্বে এবং লেখনীর গুণে যাঁরা সে সময় বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়ে নানা ধরনের উপন্যাস ও গল্প লিখে বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, বনফুল এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনোজ বসুর লেখায় দরদ ও গল্প বলার ধরন (যেমন—'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'নিশিকুটুম্ব' প্রভৃতি), বনফুলের গল্পের নাটকীয়তা-বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য (যেমন—'ডানা', 'স্থাবর' প্রভৃতি), প্রবোধকুমার সান্যালের ভ্রমণ-বিষয়ক লেখা (যেমন—'মহাপ্রস্থানের পথে' 'দূরাশার ডাক' প্রভৃতি) এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের আশ্চর্য ঐতিহাসিক আবহ তৈরির দক্ষতা, চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা (যেমন—'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'গৌড়মল্লার', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' প্রভৃতি) আর অসাধারণ গোয়েন্দাকাহিনি লেখার সাফল্য 'চিড়িয়াখানা', 'মাকড়সার রস' প্রভৃতি), তাঁদের বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন দিয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বাংলা উপন্যাসের প্রায় এক শতকের পরিক্রমণ ও বিস্তার লক্ষ করলাম। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' দিয়ে যে ধারার সূত্রপাত, পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সিদ্ধি ও সম্পূর্ণতা দিলেন। বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা সূচিত হল। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের হাত ধরে এবং অন্যান্য প্রতিভাবান লেখকদের চিন্তাস্পর্শে গল্প-উপন্যাস ক্রমশ মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রাণের বস্তু হয়ে উঠল। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে এসে বাঙালির সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থানও বদলাতে আরম্ভ করল। বাংলা ছোটোগল্পও চেষ্টা করল এই ধীর পরিবর্তমান ইতিহাসকে টুকরো টুকরো ভাবে মেলে ধরতে। প্রান্তিক, অন্ত্যজ মানুষের সমাজ-জীবন সংস্কৃতিও প্রতিবিম্বিত হতে শুরু করল এই আবর্তে। সুতরাং বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে কিছু পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও তা আত্মজিজ্ঞাসায়, সমাজভাবনায়, স্থানিক বিশেষত্বে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে, বহুরূপতায় ও দর্শনে হয়ে উঠল মৌলিক এবং আন্তর্জাতিক। গ্রাম-শহর-নদী-জঙ্গল এমনকী প্রকৃতিপ্রান্তের মানবজীবন, মানবীয় সম্পর্ক সর্বোপরি জীবন্ত মানুষের সামগ্রিকতাকে বাংলা উপন্যাস চাইল আত্মসাৎ করতে।

স্বাধীনতা এবং পরবর্তীকালের উপন্যাস-ছোটোগল্পের গতিপ্রকৃতি :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশভাগের রক্তপঙ্কিল পথে এল ভারতের স্বাধীনতা। মূল্যবোধের অধ:পতন এবং অবক্ষয়ের অভিঘাতে বাংলা উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশ ও গতিশীলতা রুদ্ধ হল। যাযাবরের ‘দৃষ্টিপাত’-এর মতো আলগা চটকদারিত্বে ভরা কিছু উপন্যাস লেখা হল। আর প্রমথনাথ বিশীর ‘লালকেল্লা’, বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’, ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’-এর ধারায় ইতিহাসের চিহ্ন লক্ষণযুক্ত অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস লেখার একটা ঘরানা তৈরি হল। এসময় আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর লেখায় শৈলবালা ঘোষ জায়া, শান্তা দেবী, সীতা দেবী কিংবা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীদের লেখালেখির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা সময়ের পদছচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেননা সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে প্রেক্ষাপটের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মিলন গড়ে তোলায় লেখিকা মুন্সিয়ানা দেখালেন। পরে লেখা ‘সুবর্ণলতা’ এবং ‘বকুলকথা’ উপন্যাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির এই স্বাতন্ত্র্যের সার্থক উত্তরাধিকার ভিন্নভাবে প্রকাশিত হল আরও পরে লীলা মজুমদার ও প্রতিভা বসুর লেখায়। শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের পরিবারকেন্দ্রিক কাহিনি লিখলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘তিথিডোর’ উপন্যাসে। কিন্তু সমকালীন সময়ের অভিঘাতে, ধ্বস্ত জীবনের অসহায়তা ব্যক্ত হয়ে উঠল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখের লেখায়। বাঙালি কি চিরতরে হারিয়ে ফেলল তা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘বারো ঘর এক উঠোন’-এ সর্বকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে রইল। রমেশচন্দ্র সেন এর ‘কুরপালা’ উপন্যাসে দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর লড়াইয়ের ছবি জীবনের ছন্দকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করল। সমরেশ বসু তাঁর ছোটোগল্পে গঙ্গার পাড় থেকে ধুলোকাদা মাখা ঘিঞ্জি খাপড়ার চালওলা বস্তিকে তুলে এনে দেখালেন মানুষের সংকট এবং জীবনসত্যের অপরিবর্তনীয়তা। ‘আদাব’ গল্পে অমানবিক অবস্থা ও পরিবেশেও মানবিকতার কাহিনি বিবৃত হল। অসীম রায় তাঁর ‘গোপাল দেব’, ‘দ্বিতীয় জন্ম’ প্রভৃতি উপন্যাসে অননুকরণীয় গদ্যে ফুটিয়ে তুললেন অস্তিত্বের সংকট, অর্থহীনতা, এবং আপাত তাৎপর্যহীন জীবনকে সমগ্রে বুঝে নেওয়ার তাৎপর্য। মধ্যবিত্ত মনের বিচ্ছিন্নতা, সংকট আর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবনমন নানা ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হল সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘কিনু গোয়ালার গলি’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘শিলালিপি’, সমরেশ বসুর ‘শ্রীমতি কাফে’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘চেনামহল’ উপন্যাসে। এঁদের ছোটোগল্পেও বিচিত্র কাহিনির মোড়কে এই টানাপোড়েন ফিরে ফিরে ধরা দিল। এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘হেডমাস্টার’, ‘পালঙ্ক’, ‘পতাকা’, নবেন্দু ঘোষের ‘কল্কি’, ‘ত্রাণকর্তা’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু’, ‘তিতির’ প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়। আবার এই সময়েই তিতাসের ঢেউয়ের মতো ধীর আলগা স্রোতে মালো পাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর সঙ্গে অন্তর্লীন জীবিকার ছবিকে কাব্যের স্তরে পৌঁছে দিলেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের লেখা অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ ও অমরেন্দ্র ঘোষের ‘চরকাশেম’ নদীকেন্দ্রিক শ্রমজীবী মানুষের আখ্যান হলেও তা কখনই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। সমরেশ বসুর প্রথম পর্বের লেখায় মানুষ-প্রকৃতি-সমাজের পারস্পরিক টানাপোড়েন মুখ্য বিষয় ছিল, কিন্তু পরের দিকে তিনি যখন মানুষের ব্যক্তিক সংকট, আত্মসমীক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ, তীব্র ও গভীর। এ প্রসঙ্গে ‘স্বীকারোক্তি’, ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’, ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ উপন্যাসের কথা বলা যায়। এছাড়া এই সময়ের কথার উপসংহার টানতে হলে কমলকুমার মজুমদারের ‘অন্তর্জলী যাত্রা’, ‘অনিলা সুন্দরী’, ‘তাহাদের কথা’ প্রভৃতি উপন্যাসের চিত্রকাব্যময় গদ্যভাষা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার বৈচিত্র্য ও সমাজ সচেতনতা এবং আশাপূর্ণা দেবীর ‘কার্বন কপি’, ‘জয়’, ‘মলাটের মুখ’, ‘ঘুষ’, ‘মাথা ধরা’ প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের পরিবেশ, সমস্যা এবং নির্মম সত্য যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেকথা আলাদা করে

উল্লেখ করতেই হয়। এরপরই একে একে মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, কবিতা সিংহ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো একদল তরুণ লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বমূলক লেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও কিছুকাল।

বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরে সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন রীতির গল্প-উপন্যাস লেখার কাঠিন্য, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ও গল্পে এক সাময়িক বন্ধ্যাত্ব ও নতুনত্বের অভাব সৃষ্টি করেছিল (অসীম রায়ের মতো কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের কথা আলাদা)। তবে বিচিত্রকর্মা, অনুসন্ধিৎসু এবং বলিষ্ঠ লেখকদের স্বতন্ত্র পথ খোঁজার নিরন্তর প্রয়াসে তা দূর হল। ক্রমে বাংলা গল্প-উপন্যাস আবার শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করল জীবনের দ্বন্দ্ব-অবক্ষয়-সংকটকে পরিবর্তমান সময়ের নতুন জল-মাটিতে পুনরাবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রসঙ্গে :

পৃথিবীর যে-কোনো ভাষাতেই প্রাথমিকভাবে নীতিশিক্ষামূলক ছোটো ছোটো লেখা দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মিটত। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যালয়ে যখন বাংলা ভাষার পঠন পাঠন শুরু হল, তখন কীভাবে তা পড়ানো হবে এটিই ছিল প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষর পরিচয়ের জন্য 'বর্ণপরিচয়' এবং সদ্য পড়তে শেখা পড়ুয়ার দ্রুত পঠনের জন্য 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বোধোদয়'—প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক লিখলেন। একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের নাম। তবে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে, এর বেশির ভাগ লেখাই হত অন্যভাষা থেকে অনূদিত, প্রচলিত কাহিনিনির্ভর বা সংস্কৃত রচনার ভাবানুবাদ। অর্থাৎ শিশুমনের উপযুক্ত মৌলিক রচনার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হল। অক্ষর পরিচয়ের বইকে আরও মনোরম ও শিশুমনের উপযোগী আর সচিত্র করে তুললেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হাসিখুশি', 'হাসিরাশি', 'ছবি ও গল্প', 'হাসিমেলা' প্রভৃতি। তখনও কিন্তু শিশুদের উপযুক্ত গল্প-কবিতা-ছড়া সেভাবে লেখা হয়নি; তবে শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন বা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কলমে কিশোর-কাহিনি রচিত হতে দেখা গেল। এঁদের রচনায় আরোপিত শিক্ষামূলক বিষয়ের পরিবর্তে কিশোর বয়সের নানাবিধ সমাজ-অভিজ্ঞতা রূপায়িত হল। সেখানে নানান উপকথা, আজগুবি বিষয়, ভূতের গল্প, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার দেখা মিলল।

বাংলা শিশুসাহিত্য যাঁর চেষ্টায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠল, তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি একই সঙ্গে রূপকথা-উপকথা-প্রচলিত কাহিনি (যেমন 'টুনটুনির বই', 'পানতাবুড়ি', 'সাক্ষীশেয়াল' প্রভৃতি), দেশ-বিদেশের লেখার অনুবাদ, তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানমূলক রচনা এবং খাঁটি বাঙালিয়ানায় সমৃদ্ধ বহু লেখা লিখলেন। পরবর্তীকালে অনেকেই যেমন সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁকে অনুসরণ করে বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বিশেষ করে সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' বইটির কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রচলিত বাংলা ছড়া বা কবিতার ঐতিহ্যের বাইরে বেরিয়ে তিনি উদ্ভট বা ননসেন্স কবিতার এক আশ্চর্য জগৎ তৈরি করলেন। তাঁর লেখা নাটক, বহু কাহিনি, ইস্কুলের গল্প, মণীষী ও অভিযাত্রীদের

জীবনী বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে। রায়চৌধুরী পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার এবং সত্যজিৎ রায় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অনেকগুলি নতুন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করলেন। ছোটো মেয়েদের অভিজ্ঞতার গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, মজার গোয়েন্দা কাহিনি প্রভৃতির সংযোজনে শিশুর কল্পনার জগৎকে অসামান্য ব্যাপ্তি এনে দিলেন।

একদিকে শিশুমনের লাগামছাড়া কল্পনা যেমন শিশু সাহিত্যে স্থান করে নিল, তেমনই প্রচলিত রূপকথার গল্প, ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালীর গল্প প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্যোগ দেখা দিল। যার প্রতিফলন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’, ‘ঠাকুরদাদার ঝুলি’ প্রভৃতিতে লক্ষ করা যায়। এই রূপকথা বলার ধরনটি আরও আধুনিক হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় ফুটে উঠল। প্রসঙ্গত তাঁর ‘ক্ষীরের পুতুল’, ‘রাজকাহিনি’, ‘নালক’, ‘বুড়ো আংলা’র নাম করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে নানান সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলন শিশুসাহিত্য, বিশেষত কিশোর সাহিত্যের ধারাকে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতার চেতনা, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কিশোর চরিত্রগুলির মধ্যে প্রকাশিত হল। এই প্রবণতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের রচনায় লক্ষ করা গেল। এঁদের লেখায় চঞ্চল, দুঃসাহসী, কখনও বা বেপরোয়া, প্রতিষ্ঠানবিরোধী অন্য এক ধরনের মুক্তিকামী ভালো আদর্শ তরুণের ‘টাইপ’ তৈরি হল।

এখানে বলা উচিত, বাংলা সাহিত্যে প্রথিতযশা প্রায় সকলেই শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু-না-কিছু লিখেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘সে’, ‘খাপছাড়া’—এ ধরনের বই ছাড়াও পঠন পাঠনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেন বলেই ‘সহজ পাঠ’-এর মতো পাঠ্যপুস্তকও তিনি লিখেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সিংহ, সাবিত্রী রায় প্রমুখের রচনায় শিশু-কিশোরেরা তাঁদের বহু-বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর এই ধারা এখনও সমানে চলেছে।

পত্রপত্রিকার কথা :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকেই ছোটোদের গুরুত্ব দিয়ে অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র সেনের বালকবন্ধু (১৮৮২) থেকে তার শুরু। এরপর ‘সখা’, ‘বালক’, ‘মুকুল’, ‘সাথী’, ‘সন্দেশ’ ‘মৌচাক’, ‘রামধনু’, ‘পাঠশালা’, ‘রংমশাল’, ‘শুকতারা’, ‘কিশোর ভারতী’, ‘কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান’, ‘আনন্দমেলা’ প্রভৃতি পত্রপত্রিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখকদের শিশুদের জন্য লিখতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

তথ্যসূচি :

১. ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা
২. ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা
৩. ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা
৪. ‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বুদ্ধদেব বসু, নাভানা
৫. সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্সা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, সুবর্ণরেখা
৬. বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

পঞ্চম অধ্যায়

লৌকিক সাহিত্যের নানা দিক

‘লোক’ শব্দে বোঝায় নিবিড় সন্নিবিষ্ট, দীর্ঘ ঐতিহ্যশালী কোনো জনসমষ্টি এবং এই জনসমষ্টির সামূহিক কৃতিকেই একত্রে বলা যায় লোকসংস্কৃতি। নামহীনতা লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, কোনো কোনো সময়ে কিছু গানে বা কাব্য-কবিতায় লেখকের ভনিতা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোককৃতিগুলির রচয়িতার নাম জানা যায় না। লোকসংস্কৃতির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যুগপৎ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দুটি ভিন্ন স্তরে সত্তাবান হয়ে ওঠা। অর্থাৎ, লোকসংস্কৃতি একদিকে যেমন তার শিকড়কে চারিয়ে দেয় জাতির অতীত ও সমষ্টিগত স্মৃতির গভীরে, তেমনই তার ডানা মেলা থাকে সমসাময়িক বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে। পরিবর্তনশীলতা এবং সংরক্ষণ—এ দুই-ই লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। লোকশিল্পীরা একদিকে যেমন তাঁদের গোষ্ঠী ও ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ, তাঁদের প্রত্যেকের স্বকীয় সৃষ্টিশীলতা এবং নিজস্ব নান্দনিকতার প্রকাশ-ও আবার তাঁদের শিল্পে একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। লোকসংস্কৃতির যে-কোনো ধারায়, তা সাহিত্য, সংগীত, চারু বা কারুশিল্প, যাই হোক না কেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাই প্রকৃতপক্ষে একটি গোটা জাতির জীবনভাবনা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন সেখানে ঘটে থাকে।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বাংলা লোকসাহিত্যের, বা বলা যায়, লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রকাশের চারটি প্রধান ধারা (ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা) নিয়ে আলোচনা করব। লোকসংস্কৃতির অন্য ধারাগুলি নিয়ে বিস্তারিতভাবে দ্বাদশ শ্রেণিতে তোমরা পড়বে। কবে, কোথায়, কে বা কারা এগুলি রচনা করেছিলেন তা জানা সম্ভব নয়, সংগতও নয়। এগুলি উদ্ভাবিত হওয়ার পর একটি জাতির ব্যাবহারিক জীবনে এবং চিন্তা ও কল্পনার জগতে এদের চিরস্থায়ী স্থান তৈরি হয়েছে, সেই কারণেই কোনো ব্যক্তি-রচয়িতার নাম ব্যতিরেকেই এগুলি হয়ে উঠেছে জাতির অক্ষয় সম্পদ।

কথা

বলা আর শোনা। অমনই স্ফূরিত হল কথা। যে বলল আর যে শুনল, তাদের সহিতত্বের সূচনা হল এই বিন্দুটিতে। সৃষ্টি হল সাহিত্যের সম্ভাবনা। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যই মৌখিক ও স্মৃতিধার্য। স্মরণে রাখার সুবিধের জন্যেই অনেকাংশে তা পদ্যের ভাষায় গ্রথিত, কেন না ছাপাখানাও তখন নেই আর পুথি নকল খুবই শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ভালো লিপিকর পাওয়া ছিল দুষ্কর, আর তাছাড়া পড়বেই বা কে? অল্প কিছু অভিজাত ছাড়া বেশিরভাগ মানুষের যে অক্ষরজ্ঞানই নেই। ফলে যে মানুষটি ছন্দে, সুরে, মামুলি ও দৈনন্দিন ভাষাকে অলৌকিক সৌন্দর্য দান করেছেন, যাঁর রচনা স্মৃতিধার্য হয়ে উঠছে অক্লেশে—সেই কবিকে সকল সমাজেই অত্যন্ত উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। এমনকি সেই গানের গায়ককেও। কিন্তু তাঁরাও যে সংখ্যায় নেহাতই অপ্রতুল। অথচ মানুষের মনের খিদে উদগ্র, কেবল পদ্যে নয়, তার চিরপরিচিত, অভ্যস্ত গদ্যভাষায় সে শুনতে চায় কথা। যে কথায় মিশে যায় স্মৃতি, সত্তা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। একটি জাতির অভিজ্ঞতা, আত্মানুসন্ধান, গৌরববোধ, স্বদেশচেতনা, গভীর বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। সর্বোপরি তাকে এসে প্রাণ দেয় কল্পনা ও সরসতা। পৃথিবীর প্রতিটি শিশুমানুষ যেমন গল্পের তাগিদে কেবলই বলে চলে—“তারপর? তারপর?” সভ্যতার শৈশবে মানুষও তেমনই এই ‘আর একটু বেশি’, এই ‘ভূমা’-র সন্ধানে তার অভিজ্ঞতা ও কল্পনা, স্মৃতি ও স্বপ্নকে মন্থন করে একের পর এক কথা-শরীর নির্মাণ করেছে। তৈরি হয়েছে ভুবনজোড়া এক অখণ্ড কথাবিশ্ব।

কথা সাহিত্যের এই মৌখিক ধারাটিকেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি লোককথা বলে। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে অদ্যাবধি আমাদের লোকশিল্পীদের যাবতীয় কাহিনিমূলক রচনাই এই লোককথা-র অন্তর্গত। তা হতে পারে রূপকথা, উপকথা, পশুকথা, নীতিকথা, ব্রতকথা অথবা পুরাণকথা, হতে পারে লোকশ্রুতি কিংবা কিংবদন্তি।

যেসব গল্পে জীবজন্তু-পশুপাখিই প্রধান, ইংরাজিতে তাদের Animal Tale বলা হয়। আদিম সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলেই লোককথার সমস্ত শাখার মধ্যে এই ধারাটিই সর্বপ্রধান। Animism বা সর্বপ্রাণবাদ, Animalism বা পশুত্বে দেবত্ব আরোপ এবং Totemism বা কোনো প্রাণীকে বংশের আদিপুরুষ সাব্যস্ত করে তার পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্দিষ্ট করার প্রথা গোটা পৃথিবীতেই চালু ছিল। এখনও এই বিশ্বাসগুলির ভগ্নাবশেষ আমাদের সংস্কার ও অবচেতনে রয়ে গেছে। স্বভাবতই জীবজন্তুর গল্পে মানুষ নিজের প্রকৃতিকেই আরোপ করেছে। এ ধরনের কাহিনিকে উপকথা বা পশুকথা বলে চিহ্নিত করা যায়। এই ধরনের গল্পের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য—কৌতুক সৃষ্টি আর নীতি প্রচার। বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে রচিত হলেও কোনো বিশেষ দেশকালের প্রতি আনুগত্য নয়, শাশ্বত মানবজীবনের প্রেক্ষাপটেই এই গল্পগুলির রসাস্বাদন সম্ভব। এই গুণেই উপকথাগুলি যুগ থেকে যুগান্তরে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণে সমর্থ। যেসব উপকথায় উপদেশ বা নীতি সংযুক্ত থাকে তাদের ইংরেজিতে Fables বলা হয়। বাংলায় বলা যায় নীতিকথা। ঈশপের গল্প, বাংলা হিতোপদেশ বা সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র নীতিকথার উদাহরণ।

লোককথার প্রধান আর একটি শাখা রূপকথা। সচরাচর এদের আয়তন দীর্ঘ, বিভিন্ন বিষয় ও শাখা কাহিনির সমাহারে জটিল, সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল পরিবেশে, অনির্দিষ্ট স্থান ও অস্পষ্ট কল্পিত চরিত্র অবলম্বনে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব রোমাঞ্চকর ঘটনাই এইসব কাহিনির উপজীব্য। ইংরেজিতে Fairy Tale প্রতিশব্দটি থাকলেও রূপকথায় পরিদের অস্তিত্ব মোটেই আবশ্যিক নয়, বস্তুত বাংলা রূপকথায় পরিদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, যেটুকু আছে তাও উত্তর-ইসলাম যুগের আমদানি। এদিক থেকে জার্মান Marchen (ম্যরশেন) বা ফরাসি Conte Populaire শব্দ দুটি বাংলা রূপকথা-র ভাবটিকে অনেকাংশে ফুটিয়ে তোলে। রাক্ষস-খোক্ষসের পুরীতে 'অজানি দেশের না জানি কী' খুঁজতে, অনেকদিন নাকি অল্পদিন ধরে ভাগ্যহত রাজপুত্র বা সাধারণ দরিদ্র নায়কের অসাধ্যসাধন, ভিন্ন ভিন্ন রাজকন্যাকে বিবাহ, দৈব সাহায্য, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা এবং পরিণামে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে নায়কের চিরকাল সুখে থাকার কামনায় পৃথিবীর সমস্ত রূপকথা নির্মিত হয়। আলেকজান্ডার এইচ. ক্রাপের মতে "By fairy tale we mean a continued narrative generally of a certain length, practically always in prose, serious on the whole, though humour is by no means excluded, centring in one hero or heroine; usually poor and destitute at the start, who, after a series of adventure in which the supernatural element plays a concious part, attains his goal and lives happilly ever after." সমস্ত লোকসাহিত্যে একমাত্র রূপকথাতেই নরবলি, রাক্ষস দ্বারা নরমাংস ভক্ষণ প্রভৃতির উল্লেখে একে প্রাগৈতিহাসিক বর্বর যুগে আদিম সমাজের প্রথম রসসৃষ্টির প্রয়াস বলে মনে করা হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে উচ্চতর ও জটিলতর সময়ের বিভিন্ন রসোপকরণ এতে এসে মেলে বলেই উপন্যাস বা রোমান্সের মতো অবিমিশ্র বিশিষ্ট কোনো সমাজজীবনের পরিচয় রূপকথায় আশা করা উচিত নয়।

লোককথার একটি বিশিষ্ট শাখা ব্রতকথা। বাংলার লৌকিক দেবতাদের অবলম্বন করে এগুলি রচিত, আদিম সংস্কার ও উচ্চতর সংস্কৃতির মিশ্রণের ফল এই ব্রতকথাগুলি, প্রবল অনিষ্টকারী দেবতাকে প্রসন্ন করে তাঁর দ্বারা প্রভূত কল্যাণসাধনের বিশ্বাসই ব্রতকথাগুলির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। উপকথায় যেমন পশুপাখির উপর মানবতা আরোপ করা হয়ে থাকে, ব্রতকথাতেও তেমনি নানা মানবিক দোষগুণের আলোকেই দেবতাদের চিত্রিত করা হয়। এই ব্রতকথাগুলিকে ভিত্তি করেই উচ্চতর সাহিত্য মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি। রূপকথা বা উপকথাগুলিই যেন ব্যাবহারিক প্রয়োজনে ব্রতকথায় পর্যবসিত হয়েছে। রূপকথার কাজ অবসর বিনোদন, ব্রতকথার কাজ গার্হস্থ্য মঙ্গলসাধন; রূপকথার অসম্ভাব্যতা আমাদের suspension of disbelief বা অবিশ্বাস্য নিরাকরণের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ব্রতকথায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার পিছনে যুক্তি হিসাবে দেবতার হস্তক্ষেপের উল্লেখ থাকে, এছাড়া ব্রতকথা ও রূপকথা-উপকথার কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই।

লোককথার আর একটি শাখা novella, বাংলায় একে রোমাঞ্চকথা বলা যায়। স্টিথ থম্পসনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, novella-র ঘটনাগুলি বাস্তব জগতের নির্দিষ্ট স্থানকালে ঘটলেও এখানে অদ্ভুত সমস্ত ঘটনা ঘটে, তবে তা লোকের বিশ্বাসের সীমারেখাকে অতিক্রম করে না। নাবিক সিন্দবাদের কাহিনি, খলিফা হারুন আল রশিদের কাহিনি, আলিফ-লায়লা বা বোকাচ্চিওর ডেকামেরন ওই জাতীয় সাহিত্য। বাংলার 'সায়ফুল মুলক বদিউজ্জামান'-জাতীয় কাহিনিতে রূপকথা ও রোমাঞ্চকথার সংমিশ্রণ দেখা যায়, একে বলা যায় Novella Marchen।

লোককথায় আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা বীরকথা বা Hero tale। একটিমাত্র কেন্দ্রীয় দুঃসাহসী ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বীর চরিত্রকে অবলম্বন করে একাধিক কাহিনি তৈরি হলে তাকে বীরগাথা বলা যায়। হারকিউলিস বা থিসিয়াসের গ্রিক কাহিনি বা সংস্কৃত বেতাল পঞ্চবিংশতির বিক্রমাদিত্যের কাহিনি বীরকথার উদাহরণ। রুশ বগাতিরদের কাহিনিও এর মধ্যে পড়বে। আবার অলৌকিকতা না থাকা সত্ত্বেও রবিনহুড বা রঘু ডাকাত প্রমুখ বাংলার ডাকাতদের কাহিনিও বীরকথার অন্তর্গত হতে পারে।

লোককথার একটি বিশিষ্ট শাখা, পুরাণকথা। ইংরাজি Myth শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকপুরাণ', 'লৌকিক পুরাণ', 'লৌকিক পুরাকাহিনি', 'পুরাণকথা', 'পুরাকথা' প্রভৃতি শব্দের অবতারণা ঘটেছে। যদিও আমাদের দেশে অষ্টাদশ পুরাণ বা পরবর্তীতে অর্বাচীন যে পুরাণগুলি প্রচলিত রয়েছে তার সঙ্গে Myth-এর কিছু পার্থক্য আছে। আমাদের দেশে পুরাণসাহিত্য মূলত আর্য-প্রাগার্য সংস্কৃতির মিলনের দ্যোতক, কোনো বিশিষ্ট দেবতার লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশক এবং ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। Myth-এ ধর্মের বন্ধন নয়, বিশ্বাস এবং অতীত বিশ্বের কাহিনিই প্রধান। Myth প্রসঙ্গে ফোকলোর অভিধানে বলা হয়েছে— "A shortly presented tale as having actually occured in a previous age, explaining the cosmological and supernatural traditions of a people, their gods, heroes, cultural traits, religious beliefs etc. Thus myths tell of the creation of man, of animal, of landmarks; they tell why a certain animal has its characteristics (e.g. why the bat is blind or files only at night), why or how certain natural phenomena came to be (e.g. why the rituals and ceremonies began and why then continue." দেশের বা সমাজের আদি মানুষের আবির্ভাব, পৃথিবীর সৃষ্টি, দেবদেবীর জন্মগ্রহণ, মানুষের বিবর্তন, সনাতন ধর্মের আবির্ভাব, স্রষ্টার মূল ও প্রকৃতি, আকাশ-মর্ত্য ও পাতালে মানব-দেবতা ও অন্যান্য জীবের জন্ম, লোকাচারগুলির উৎস, সেগুলি পালনের প্রয়োজনীয়তা—এই বিষয়গুলি নিয়েই সকল দেশের পুরাকাহিনির কাঠামো গড়ে উঠেছে।

লোককথার শাখায় আর এক শ্রেণির রচনার নাম করা যায়। জার্মান ভাষায় একে বলা হয় sage, বাংলায় এর নাম করা যায় স্থানিক কথা। বিশেষ কোনো স্থানকে কেন্দ্র করে এ ধরনের কাহিনি গড়ে ওঠে। এতেও থাকে নানা অবাস্তব ব্যাপার স্যাপার, তবে তা সত্য বলেই বিশ্বাস করা হয়।

লোককথার শ্রেণিবিন্যাসে রঙ্গকথা নামে আরও একটি ধরন পাওয়া যায়, পৃথিবীর সর্বত্রই ছোটো ছোটো কাহিনিতে হাসি-তামাশা, চুটকি-রঙ্গ-রসিকতা প্রকাশ করা হয়। ইংরাজিতে এসব কাহিনিকে Jest, Humorous Anecdotes এবং Merry Tales বলা হয়। এছাড়া বোকা লোকদের নিয়ে বিদ্রুপ, লোক ঠকানোর সচরাচর অশ্লীল যেসব কাহিনি পাওয়া যায় তাকে বলে Numskull tale। এই ধরনের কাহিনি কখনো-কখনো বিশেষ নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তৃত কাহিনি-পরম্পরা তৈরি করে, কখনও প্রশংসিত, কখনও নিন্দিত হয় এই প্রবঞ্চক নায়ক/নায়িকারা। পাজি পিটার, টেটন বুড়ো, খোজা নাসিরুদ্দিন বা ঢাকার কুট্টিদের গল্প এই শ্রেণির অন্তর্গত, গোটা পৃথিবীতেই এই ধরনের কাহিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

লোকপ্রবাদ ও প্রবচন

‘প্রবাদ’ শব্দটি উচ্চারণমাত্রে তোমাদের অনেকেরই হয়তো প্রথমেই মনে পড়বে লি ফক-এর সৃষ্টি পৃথিবী বিখ্যাত কমিকস্ ‘অরণ্যদেব’ বা ফ্যান্টমের একটি বিখ্যাত পাঞ্চলাইন—‘প্রাচীন অরণ্য প্রবাদ’। আমরা কথায় কথায় প্রায়ই বলে থাকি ‘প্রবাদপ্রতিম’। কারণ প্রবাদ প্রায় পুরাণের মতোই শক্তিশালী। একটি পুরাণে যেমন একটি দেশের, একটি জাতির, একটা বড়ো কালপর্বের প্রেক্ষাপটে তার সমগ্র অস্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে, একটি প্রবাদেও তেমনই একটি জাতির ভূয়োদর্শন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার নির্যাস একটিমাত্র বাক্য বা বাক্যাংশে প্রতিফলিত হয়, এক-একটি পুরাণে যেমন সেই সেই জাতির নাড়িকে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি প্রবাদই সেইরকম সেই ভাষা গোষ্ঠীর, সেই জাতির মানুষকেও চিনিয়ে দিয়ে যায়। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভাবগত মিল আমাদের আপাত বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানব-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যকেই সমর্থন করে। প্রবাদ সম্বন্ধে আরও একটা কথা চালু আছে। প্রত্যেকটি প্রবাদই সত্যি। কেননা প্রবাদ কোনো একজনের রচনা নয়, কখনোকখনো খুব শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিকের কোনো কোনো পংক্তি প্রবাদের মর্যাদা পেলেও প্রবাদের একটা মূল বৈশিষ্ট্য তার রচয়িতার নামহীনতা। এই নামহীনতা অবশ্য লোক সংস্কৃতিরই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি প্রবাদেই তাই রয়েছে বহুদিনের বহু মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবন ও জগৎ, সময় ও সমাজকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার বেদনা ও উত্তাপ। কখনও সেখানে মিশেছে তির্যক ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ। কখনও করুণা ও আত্মসমালোচনা, কখনও বা নিরপেক্ষ দর্শকের গভীর নিরাসক্তি। আপাত অর্থে পরস্পরবিরোধী প্রবাদগুলিও তাই সমানভাবে সত্য। দুটি আলাদা পরিস্থিতিতে ‘দুষ্ট গোরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো’ এবং ‘নাই মামার চেয়ে কানামামা ভালো’ প্রবাদ দুটি একইসঙ্গে সত্যি হয়ে উঠতে পারে। আর এইখানেই প্রবাদের অমরত্বের সম্ভাবনা। যে মুহূর্তে একটি নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মানুষের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে একটি প্রবাদের প্রয়োগ হবে, সেই প্রবাদটি বহু বহু প্রাচীন হলেও সেই মুহূর্তটিতেই আবার নতুন করে বেঁচে উঠল, তা হয়ে উঠল শাশ্বত ও সর্বজনমান্য।

প্রবাদগুলিতে নানা সময়েই বিভিন্ন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ জড়িত থাকে। ব্যক্তিনাম ও স্থাননামও অনেক সময়ে হয়ে ওঠে প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে কিনা বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা টপকে ব্যাপক

সাধারণীকরণের এবং নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হতে পারার ক্ষমতাই একটি প্রবাদের জনপ্রিয়তা ও অস্তিত্বের বিষয়টি নির্ধারণ করে। এককথায় প্রবাদ হবে সংক্ষিপ্ত, সরল, রূপক-অলংকার বহুল, সহজ, প্রাচীন, এবং সর্বোপরি সত্য। তবে কিনা লোকোক্তি মাত্রেই প্রবাদ নয়, ‘চুরি করা মহাপাপ’ নীতিবাক্য মাত্র, প্রত্যক্ষ জীবননির্ভর এবং সরস নয় বলেই তা প্রবাদ হয়ে উঠতে পারেনি।

‘প্রবচন’ শব্দটি নিয়েও কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। বাংলায় ‘বচন’ শব্দটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়—যেমন, ডাকের বচন, খনার বচন, বৃদ্ধের বচন, চাণক্য বচন প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে প্রবাদ বলতে আমরা এখন যা বুঝি এক সময় বচন শব্দ দিয়েই তা বোঝানো হত। রবীন্দ্রনাথ যদিও অন্য মতের পোষক। প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে দেখি তাঁর মতে প্রবাদ কথাটির মধ্যে একটি গল্পের ভাব আছে, কিন্তু প্রবচন ছাঁটা-কাটা কথা মাত্র, আনন্দ-দুঃখ বা কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছাড়া তার আর অন্য কিছু পরিবেশনের নেই। যদিও বর্তমানে প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় সমার্থক এবং পরিপূরক শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে কৃষি-বিষয়ক খনার বচন বা লৌকিক জ্যোতিষ বিষয়ক ডাকের বচনও ব্যাবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকেই সহজ-সরল অথচ সালংকারভাবে প্রকাশ করে বলে এগুলিকেও প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কোনোকালে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কথিত হলেও প্রবাদ মাত্রেই সর্বসাধারণের নির্বিশেষ সম্পত্তি। বস্তুত একটি প্রবাদের সাফল্য, এমনকি অস্তিত্ব নির্ভর করে লোকমানসের সরল, স্বাভাবিক সমর্থনের উপর। বিষয়বস্তু নয়, এই সাফল্যের ভিত্তি সহজ প্রকাশভঙ্গি, সাধারণ বুদ্ধির সরল চমৎকারিত্ব, সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এবং প্রয়োগের সার্থকতায়। শব্দের স্বল্পতা এবং অর্থের আধিক্য প্রবাদের একটি সাধারণ লক্ষণ। সেই দিক থেকে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা বাগ্‌ধারার সঙ্গেও প্রবাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলা প্রবাদের বিষয়বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে তার একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

দেবদেবী বিষয়ক : রাখে হরি মারে কে?
একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।

পৌরাণিক চরিত্র-বিষয়ক : একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর।
সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ?

ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্র বিষয়ক : রাণী ভবানী আর ফুল জেলেনী।
খায় লয় চাঁদ রায়ের, নাম লয় কেদার রায়ের।

সমাজ-বিষয়ক : তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।
বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা।

পরিবার-বিষয়ক : মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।
ভালো কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে/
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

মানবদেহ বিষয়ক : কান টানলে মাথা আসে।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

আচার-আচরণমূলক : আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালোবাসি।

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত বস্তু বিষয়ক : শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।

নিসর্গ প্রকৃতি বিষয়ক : আমড়াকাঠের ঢেকি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

মেঘ না চাইতে জল।

কৃষিকর্ম সংক্রান্ত : লঙ্কা পুঁতো গুড়ো, বেগুন পুঁতো বুড়ো।

চার আল উঁচু, মাঝখানে নিচু।

খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত : দুধের সাধ ঘোলে মিটানো।

নেই কাজ তো খই ভাজ।

পশু-পক্ষী বিষয়ক : বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া,

শকুনের নজর ভাগাড়ের দিকে।

বাদ্যযন্ত্র-বিষয়ক : খাই দাই ডুগডুগি বাজাই।

সানাইয়ের পোঁ ধরা।

বিলাসোপকরণ বিষয়ক : গোদা পায়ে আলতা-খাঁদা নাকে নথ।

মায়ের গলায় দড়ি/বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি।

প্রেম বিষয়ক : যার সঙ্গে মজে মন/কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

যদি হয় সুজন/তেঁতুলপাতায় নজন।

স্থাননাম বিষয়ক : মুখে পান, হাতে চুন/তবে জানবে মানভূম।

চাল, চিঁড়ে, গুড়/তিন নিয়ে দিনাজপুর।

ব্যক্তিগত-বিষয়ক : লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

হরি ঘোষের গোয়াল।

লোক শিক্ষামূলক : আগে পা পরে গা/মাথায় দিয়ে নাইতে যা।

আলো হাওয়া বেঁধো না/রোগ ভোগ সেধো না।

লোক সিদ্ধান্তমূলক : নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি/পরের বেলায় দাঁতকপাটি

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

লোক সাংবাদিকতা বিষয়ক : গুলি, খিলি, মতিচুর/এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

কাগজ, কলম, কালি/তিন নিয়ে বালি।

বিবিধ : গাইতে গাইতে গায়েন/বাজাতে বাজাতে বায়েন। (অধ্যবসায়)

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নাও তার। (অভিজ্ঞতা)

পড়েছি মোগলের হাতে/খানা খেতে হবে সাথে। (জোরজুলুম)

বাহির বাড়ি লণ্ঠন/ভিতর বাড়ি ঠন ঠন। (বাহ্যাড়ম্বর)

মুখ খুব মিঠে/নিম-নিশিন্দা পেটে। (কপটতা)

একের বোঝা, দশের লাঠি। (সংঘশক্তি)

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি। (প্রতারণা)

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা। (অবাস্তব)

হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। (আইন)

জোর যার মুলুক তার। (সামন্ত শাসন)

ছড়া

ছেলেভুলানো ছড়ার বিশেষত্বের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত-সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় এবং মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য; তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।...’’ ছড়ার জগৎ যে মূলত শিশুমানবের জগৎ এবং সেই জগতের আস্বাদকও মূলত শিশুই—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শিশুমানুষ যে চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখে তা সতত সঞ্চরণশীল এবং সদা অনুসন্ধিৎসু। সমস্ত পৃথিবীটাই তার কাছে নতুন বলে গভীর অভিনিবেশে কোনো একটিমাত্র বিষয় বা বস্তুতে মনঃসংযোগ করবার প্রবৃত্তি তার নেই, সদা পরিবর্তনশীল জীবননাট্যের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিও বরং তার সদাজাগ্রত কৌতূহলী চোখ এড়ায় না। এম. ব্লুমফিল্ড লিখেছেন, “The popular rhyme is a striking example of the poetic primitive, going back in its construction and psychological essence almost to the primitive archaic times, and at the same time it is frequently an expression of new attitudes among the masses of the people.” ছড়াগুলি ‘poetic primitive’, কোনো বিশেষ বার্তা বা মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা রচিত নয়, অর্থপূর্ণ সংলগ্নতার কোনও দায়-ও তার নেই। শিশুর সদাচঞ্চল দৃষ্টিপাতের মতোই এখানেও টুকরো টুকরো পরস্পরবিচ্ছিন্ন অজস্র ছবির সমাহার। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মত অনুসারে বিভিন্ন অবদমিত ইচ্ছা ও স্বপ্ন-প্রতীকেরই প্রকাশ ঘটে আদিম ছড়াগুলিতে, পরবর্তী সময়ে তা হয়ে উঠতে পারে আরও সুজটিল, অর্থপূর্ণ ও সচেতন। যে-কোনো জনপ্রিয় ছড়া নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে,
চাঁই মিরগেল ঝাঁঝর বাজে।।
বাজতে বাজতে পলো ঢুলি।
ঢুলি গেল কমলা ফুলি।।
কমলাফুলির টিয়েটা।
রাঙা মামার বিয়েটা।।

প্রায় সকলের পরিচিত এই ছড়াটির প্রথম দুই কি তিন লাইনে যে ছবিগুলি পাই শেষ তিন পঙ্‌ক্তির ছবিগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুঁজে বের করা মুশকিল। আপাতভাবে কোনো যুক্তি এখানে নেই, আর সম্ভবত যুক্তিবোধের ধার শিশু খুব একটা ধারেও না। এই টুকরো ছবিগুলির মতোই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছড়ার অন্তর্নিহিত ছন্দসৌন্দর্য এবং সুরনিরপেক্ষ ধ্বনিসম্ভূত শব্দসংগীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে ‘‘জল পড়ে/পাতা নড়ে”—এই ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তি দুটির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে শব্দের এই নিজস্ব ধ্বনিমাধুর্যের আস্বাদনজাত শিহরণের বর্ণনা দিয়েছেন। ‘পথের পাঁচালী’-র বালক অপুকেও দেখব প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের দেওয়া শ্রুতলিখনে ‘সীতার বনবাস’-এর অংশবিশেষের বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র তার শব্দঝংকারে কীভাবে মোহিত হয়েছিল। বস্তুত, শিশুর কাছে এই ছন্দ-সংগীতের অহৈতুকী আবেদনই মুখ্য। অর্থই যে অনর্থের মূল তা না জেনেও পৃথিবীর কোনো শিশুই ছড়ার অর্থ নিয়ে খুব ভাবিত নয়, সেই অর্থে সমস্ত সার্থক ছড়ার মূল রস অদ্ভুত। এডওয়ার্ড লিয়র বা সুকুমার রায়ের বহু-বহু পূর্বেই আমাদের মা-দিদিমারা আমাদের শৈশবের আকাশকে খাঁটি ননসেন্সের আলোয় ও রসে মাখামাখি করে দিয়েছেন। অন্যদিক থেকে বলা যায় ছড়াই হল সংগীতের পূর্ব পর্যায় (আজকের হিপহপ বা র‍্যাপ শুনে একথা আরও বেশি করে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, কেবল কথাটা উলটো করে বলতে হবে, এই আর কি)। শুধু তাই নয়, ধাঁধা-প্রবাদ-মন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে যে ছন্দোসৌন্দর্য তা-ও লোকবিজ্ঞানীদের মতে ছড়ার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।

অধিকাংশ ছড়ারই মূল উদ্দেশ্য শিশুর মনোরঞ্জন। হয় তা ঘুমপাড়ানি, নয়তো মনভোলানো। মা-দিদিমা-ঠাকুমারা এগুলির রচয়িতা। কিন্তু এ ছাড়াও কিছু ছড়া আছে যা মূলত খেলার সঙ্গে যুক্ত। শৈশব-কৈশোরের অহেতুক আনন্দ, অপার বিস্ময়বোধ, অস্ফুট প্রকাশসামর্থ্য এবং অসংলগ্ন উদ্দাম ও স্বাধীন সৃজনশীলতায় এগুলি জীবন্ত ও বর্ণময়। এই ছড়াগুলিও ছেলে ও মেয়েদের খেলার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চরিত্রগতভাবে আলাদা হয়ে যায়। আর কিছু ছড়া আছে যা একান্তভাবেই মেয়েদের নিজস্ব ভুবনটির থেকে উৎসারিত। আমাদের সমাজব্যবস্থায় প্রধানত অবদমিত নারীহৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রকাশ এবং অনেকাংশে ইচ্ছাপূর্তির প্রতিফলন হয়ে উঠেছে এই ছড়াগুলি। এই প্রবন্ধে ‘মেয়েলি ছড়া’ নামে কয়েকটি শ্রেণিতে কিছু ছড়া বিন্যস্ত করা হল। তোমাদের অঞ্চলে প্রচলিত এই রকমের আরও বেশ কিছু ছড়া সংগ্রহ করে লিখে ফ্যালো দেখি।

ঘুম পাড়ানি ছড়া :

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো,
খাট নেই, পালঙ্ক নেই
খোকার চক্ষু পেতে বোসো।
এই গালে দিনু চুমো দে রে ওই গাল,
ঘুমে ঘোর খোকা মোর চুমোর মাতাল।।

ছেলে ভুলানো ছড়া :

সোনা সোনা ডাক ছাড়ি,
সোনা নেইকো বাড়ি,
মনা মনা ডাক ছাড়ি
মনা আছে বাড়ি।
আয়রে মনা আয়,
দুধ মাখা ভাত কাগে খায়।

ছেলে খেলা ছড়া :

(১)

আইগন বাইগন তাড়াতুড়ি
যুদ মাস্টার শ্বশুর বাড়ি,
রেল (রেন) কাম, ঝমা ঝম্,
পা পিছ্‌লা আলুর দম্।
ইস্টিশানে মিষ্টি গুড়
সখের বাদাম গোলাপ ফুল।

(২)

আড়ি আড়ি আড়ি
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর
কি করবি কর
হনুমানের ল্যাজ ধরে
টানাটানি কর।

মেয়েলি ছড়া :

(১)

এলাডিং বেলাডিং সইলো,
একটি খবর আইলো।
কী খবর আইলো,
রাজা একটি বালিকা চাইলো।
কোন্ বালিকা চাইলো,
আরতি বালিকা চাইলো,
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও,
দিয়ে যাও দিয়ে যাও বালিকাকে—।

(২)

আম পাতা জোড়া জোড়া,
মারবো চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে,
বন্দুক ছুড়ে মেরেছে।
অলরাইট ভেরি গুড
মেম খায় চা বিস্কুট।।

ধাঁধা

যখন কেউ কোনো ধাঁধার উত্তর জানতে চায় তখন উত্তরদাতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ভাষা ও শব্দের উপর দখল এবং ব্যাপকভাবে জীবন সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপ্ত জ্ঞানের পরীক্ষাই তখন তার কাছে কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু ধাঁধার সৃষ্টি ও বিবর্তনের ইতিহাস আরও বর্ণময় এবং রহস্যজনক। ইংরাজি 'riddle' বা 'enigma' শব্দদুটির বিশ্লেষণে একটি চমকপ্রদ দিক ফুটে ওঠে। প্রাচীন ইংরাজি ক্রিয়ামূল 'raedan' থেকেই পরবর্তী সময়ে এসেছে ইংরেজি 'rede' বা জার্মান 'rat(n)en' এবং প্রাচীন গ্রিক 'aineo' শব্দ থেকে এসেছে ল্যাটিন 'aenigma', ফরাসি 'enigme' বা ইংরাজি 'enigma' শব্দ। সর্বক্ষেত্রেই শব্দগুলির আদি অর্থ—উপদেশ প্রদান। সংস্কৃত 'প্রহেলিকা' শব্দই আধুনিক হিন্দি বা উর্দুতে 'পহেলি' এবং বাংলায় 'হেঁয়ালি' শব্দের রূপ নিয়েছে। সিলেট অঞ্চলে ধাঁধাকে বলা হয় 'পই', টাংগাইলে 'শিলোক' বা 'ঠল্লুক'। কিন্তু শুধু উপদেশ প্রদানের কামনাই নয়, ধাঁধার সঙ্গে যুক্ত আছে আরও গভীরতর অভিপ্রায়। জেমস্ জর্জ ফ্রেজার তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত 'The Golden Bough' বইতে দেখিয়েছেন যে গোটা পৃথিবীতেই আদিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ধাঁধার সঙ্গে মন্ত্র বা ম্যাজিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করে। পারসি 'ম্যাজি' (পুরোহিত)-শব্দ থেকে এসেছে ম্যাজিক শব্দ, যার অর্থ প্রাকৃতিক বা দৈহিক দৈব-দুর্বিপাককে বিদূরিত করার করণকৌশল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখনও বৃষ্টি আবাহনে, বীজরোপণ বা ফসলের মরসুমে, দৈব-দুর্বিপাকে, বন্যায়-দুর্ভিক্ষে, বিবাহে কিংবা প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধাঁধা জিজ্ঞেস করার এবং উত্তর দেওয়ার প্রথা আছে। বিশ্বাস, ধাঁধার উত্তর দিতে পারলে আপদ-বালাই দূর হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনও সুখসমৃদ্ধিময় হয়ে উঠবে। এই অর্থে আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত ধাঁধা বা হেঁয়ালিগুলির বীজ নিহিত রয়েছে মানুষের একসময়ের বিশ্বাস ও

আচরণের সর্বপ্রাণবাদ ও সমপ্রক্রিয়ার ম্যাজিকের ধারণায়। তবে কি না সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। অ্যান্ড্রু ল্যাং বলেন, “They (riddles) were very ancient and had been handed down, with a gradual refining, from ages of savagery to ages of civilization”. [Andrew Lang, Introduction to Cox. Ciuderella. pp-xiff; op, cit. Thoepson, The Folletales. p. 322]। ধাঁধাগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হয়, স্মৃতিধার্য হয়ে ওঠে এবং বহু শতাব্দী ধরে টিকে থাকে। স্মরণে রাখার সুবিধের জন্যেই তা ক্রমে সংক্ষিপ্ত, সরস ও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে এবং কথা বা প্রবাদের মতোই মানুষের সমষ্টিগত ও সুবিন্যস্ত চিন্তনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় প্রকাশভঙ্গিমার মর্যাদা পায়। তবে ধাঁধার মৌখিক রূপের মতোই তার লিখিত নিদর্শনও কিছু কম প্রাচীন নয়। খ্রি. পূ. ১০০০ বছরের সময়ে রচিত ঋগ্‌বেদেও ধাঁধার নিদর্শন আছে। ‘বৎসরকে’ বেদ-গ্রন্থগুলিতে বহুস্থলেই ‘দ্বাদশ শলাকাবিশিষ্ট চক্র’ বলা হয়েছে। পারস্যের কবি ফিরদৌসির ‘শাহ্‌নামা’ গ্রন্থেও এই ধাঁধার উল্লেখ আছে। মহাভারতেও প্রচুর ধাঁধার নমুনা রয়েছে। বকরূপী ধর্মের যুধিষ্ঠিরকে করা প্রশ্ন সর্বাগ্রে মনে আসবে। গ্রিস দেশের থিব্‌সে রাজা অয়দিপাউসকে করা স্ফিংক্সের প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই ধাঁধাটি আশ্চর্যজনক মনে হলেও একই রূপে বাংলাভাষাতেও রয়েছে।

সকালবেলা চারপায়ে হাঁটে
দুপুরবেলায় দুই পায়ে হাঁটে
বিকালবেলায় তিন পায়ে হেঁটে
দেশে চলে বাবাজি। —(উত্তর : মানুষ)

কথিত আছে খ্রিস্ট পূর্ব নবম শতকে গ্রিক মহাকবি হোমার জোঁক-সম্বন্ধীয় একটি ধাঁধার উত্তর না দিতে পেরে লজ্জায় প্রাণত্যাগ করেন। আরব দেশেও চতুর্দশ শতকের হাজি খলিফা বা বসোরা অঞ্চলের আল হারিরি উৎকৃষ্ট ধাঁধার জন্য সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছিলেন। আরব্য উপন্যাস, ইহুদি গ্রন্থ, বাইবেল, স্পেনীয় ক্রবাদুর সাহিত্য, পারস্য সাহিত্য—সর্বত্রই ধাঁধার অজস্র নমুনা পাওয়া যাবে। পারস্য সাহিত্যে কবি ফিরদৌসির ‘জাল’ এবং আরব্য সাহিত্যের ‘বাদশা সোলেমান ও রানি বিলকিসের ধাঁধা’ বিশেষ উল্লেখ্য, একাদশ শতাব্দীতে লিখিত সোমদেবের ‘কথাসরিৎসাগরে’ও রাজা বিনীতমতির ধাঁধার উত্তর না দিতে পারায় রাজকন্যার আত্মসমর্পণের কাহিনি পাওয়া যায়। বস্তুত কঠিন ধাঁধার উত্তর দিয়ে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বলাভ কিংবা পণ্ডিতরা অসমর্থন হওয়ার পরে এক অশিক্ষিত মানুষের কঠিন ধাঁধার উত্তর দিয়ে ফেলা অথবা কঠিন হেঁয়ালির উত্তর প্রদানে রাজপুত্রকে রাজকন্যার গোপনে সাহায্য—গোটা পৃথিবীর কথাসাহিত্যেই এই মোটিফগুলি খুব জনপ্রিয়। বলা বাহুল্য কথা ও প্রবাদের মতোই বহু ধাঁধাও বিশ্বজনীন। ধাঁধাগুলি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিভ্রমণ করেছে না পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের চিন্তার সাযুজ্যই এর কারণ, তা এককথায় বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও চর্যাপদ-সহ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থেও ধাঁধার ব্যবহার সুপ্রচুর। আগের কথার রেশ ধরেই বলা যায়, এই সব ধাঁধার অনেকগুলিই পৃথিবীর অন্যত্রও প্রচলিত থাকতে দেখা যাবে। চণ্ডীমঙ্গলের বাকশক্তিসম্পন্ন শুকপাখির ধাঁধা—

বিধাতা নির্মাণ ঘরে নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহার।।

যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতা সৃজন ঘর করে খান্ খান্।।— (উত্তর : ডিম)

পারস্য ভাষার ‘তুতীনামা’-র তোতাকেও এই একই ধাঁধা বলতে দেখা যাবে। ড. আশরাফ সিদ্দিকী দেখিয়েছেন,

বন থেকে বেরুল টিয়ে।
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।।

—ধাঁধাটি সামান্য কথাভেদে চব্বিশ পরগনা, ঢাকা আর চট্টগ্রামে ‘আনারস’, পাবনা, রাজশাহিতে ‘কলার থোড়’; বীরভূম, মুরশিদাবাদে ‘পেঁয়াজ’ এবং টাঙ্গাইলে ‘লাঙলের ফাল’—অর্থে প্রচলিত রয়েছে। আরও আশ্চর্য এই যে, এই ধাঁধাটিই ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড এবং আমেরিকার নানা অংশে কখনও ‘পাখি’ কখনও ‘শিকারি’, কখনও বা ‘সন্ন্যাসীর’ উপমায় উপস্থিত হয়েছে।

প্রচলিত ও লৌকিক ধাঁধাগুলি কখনো-কখনো ছন্দোমাধুর্যে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে।

থাল ঝন্ ঝন্ থাল ঝন্ ঝন্ থাল নিল চোরে।
বৃন্দাবনে আগুন লাগলো কে নিভাইতে পারে।।—(উত্তর : রোদ)

কখনও তা প্রবল আক্রমণাত্মক ও অপমানজনক,

কান্দার উপর কান্দা।
যে না ভাঙ্গাইতে পারে তার বাপ ভাই সহ বান্দা।।—(উত্তর : কলার ছড়ি)

কখনও বা মাত্র দুটি-তিনটি লাইনে বিরাট মহাজাগতিক একটি ছবি আঁকা হয়ে যায়।

রাজার বেটা মরিয়া রইছে, দেখিবার নাই।
রাজার উঠান পরিয়া রইছে, ঝাড়িবার নাই।
হাজার ফুল ফুটিয়া রইছে, তুলিবার নাই।—(উত্তর : চাঁদ, আকাশ, তারা)

কখনও বা তা গভীর দার্শনিকতার ইঙ্গিতবাহী।

উঠতে সূর্য নমস্কার।
পড়তে সূর্য নমস্কার।।

এই ধাঁধার উত্তর, কলার থোড়। সূর্যের দিকে মুখ করে যার জন্ম, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার—মৃত্যুও তার তেমনই সূর্যমুখী, প্রায় একটি জাপানি ছবির মতোই মিতায়তনিক ও সংহত এই দুটি পঙ্ক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনের সংক্ষিপ্ততা ও অসারতা এবং মৃত্যুর অমোঘ বাস্তবতাকে। এইভাবেই আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ধাঁধাগুলি। পুরনো অনেক ধাঁধাই হারিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সময় নিজস্ব দাবিতে নতুন নতুন ধাঁধার জন্মও দিচ্ছে, দেখা যাক তোমাদের প্রজন্মের এথিকাল হ্যাকাররা সেইসব ধাঁধা ক্র্যাক্ করতে পারো কি না। ধাঁধার বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ এবং কিছু ধাঁধার ফিরিস্তি দেওয়া রইলো; তোমাদের অঞ্চলে প্রচলিত ভিন্ন কোনো ধাঁধা যদি খুঁজে পাও তবে তোমরাই লিস্টটা আর একটু বড়ো করে তুলতে পারবে।

জীব-জন্তুর সঙ্গে তুলনা :

১. ছোট্ট প্রাণী হেঁটে যায়
আস্ত পা-টা গিলে খায়।—জুতো

২. মুখ নাই কথা বলে
পা নাই হেঁটে চলে।—ঘড়ি

৩. সব কিছু পেরিয়ে যায়
নদীর কাছে গিয়ে ভিরমি খায়।—পথ

পাখির সঙ্গে তুলনা :

বেলে হাঁসে আড্ডা পাড়ে
কে কতটি গণতে পারে?—তারা

জন্তুর সঙ্গে তুলনা :

বাড়িতে আছে কাঠের গাই
বছর বছর দুধ খাই।—খেজুর গাছ

লোকের সঙ্গে তুলনা :

১. একটু খানি গাছে
রাঙা বউটি নাচে।—মরিচ

২. এক মায়ের দুই ছেলে
কেউ কাউকে দেখতে নারে।—চক্ষু

গাছের সঙ্গে তুলনা :

এক হাত লম্বা গাছটা
ফল তাতে পাঁচটা।—হাত ও আঙ্গুল

কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা :

১. ঘর আছে দরজা নাই
মানুষ আছে কথা নাই।—ডিম

২. আল্লার কি কুদরৎ
লাঠির মধ্যে সরবৎ।—ইক্ষু

কার্যাবলির সঙ্গে তুলনা :

১. আমার আছে তোমার আছে
বাবার আছে তাহার আছে
দাদার আছে দিদির আছে
তবু ত পাঁচ মিনিটের বেশি রাখার সাধ্য নাই।—শ্বাসপ্রশ্বাস

২. সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ।—লবণ

পরস্পর বৈপরীত্যের আরোপ :

হাত নাই পাও নাই দেশে দেশে ঘুরে
তার অভাব হলে লোক অনাহারে মরে।—টাকা

দ্বিতীয় পর্ব

ভাষা (প্রথম পর্যায়)

প্রথম অধ্যায়

বিশ্বের ভাষা ও পরিবার

সারা পৃথিবীতে কতগুলো ভাষা আছে, নির্দিষ্টভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, হাজার তিনেক ভাষা ও সেসব ভাষার অসংখ্য বৈচিত্র্য ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে। তবে বেশির ভাগ ভাষারই ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ লক্ষ থেকে কয়েকশোর মধ্যে। এতগুলো ভাষার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সে নিয়ে ষোড়শ শতকেই রোমান ক্যাথলিক মিশনারিরা লক্ষ করেছিলেন; পরবর্তীকালে জার্মান পণ্ডিত শুলৎস এবং ফরাসি ভাষাবিদ ক্যারদ্যুও বলেছিলেন যে সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষার সাদৃশ্য আছে। ১৭৮৬ সালে কলকাতার রয়্যাল সোসাইটির অধিবেশনে উইলিয়ম জোন্‌স তাঁর বক্তৃতায় সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন ও জার্মানিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে গভীর মিলের কথা বলেন।

এইভাবে ভাষাগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে ভাষাগুলির অতীত ইতিহাস পুনর্গঠন করে গোত্রনির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর এতগুলো ভাষাকে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিতে বর্গীকরণ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলি হল—১. ভাষার রূপতত্ত্ব বা আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ, ২. গোত্র বা বংশানুযায়ী বিভাগ, ৩. মহাদেশ অনুযায়ী বিভাগ, ৪. দেশভিত্তিক বিভাগ, ৫. ধর্মীয় শ্রেণিবিভাগ এবং ৬. কালগত শ্রেণিবিভাগ। এই ছয়রকম পদ্ধতির মধ্যে মহাদেশ বা দেশভিত্তিক সমস্যা হল যে একই ভাষা বিভিন্ন দেশে, এমনকি মহাদেশে ছড়িয়ে থাকতে পারে। ভাষা যেহেতু সময়ের সঙ্গে পালটায়, তাই নির্দিষ্ট কালপর্বে কোনো ভাষার বর্গীকরণ সম্ভব নয়। সম্ভব নয় 'ধর্ম'কে ভিত্তি করে বর্গীকরণ, কারণ একটি ভাষা বহু ধর্মের মানুষ ব্যবহার করে। বাস্তবে এমন কোনো ভাষা নেই যা শুধুমাত্র ধর্মের সঙ্গেই জড়িত।

ভাষার রূপতত্ত্ব বা আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ :

ভাষার মধ্যে বাক্য ও শব্দের বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তাকেই রূপতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ বলা যেতে পারে। এই ধরনের বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন ভাষার সাংগঠনিক অবয়বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের ভাষা থেকে জেনেছি যে শব্দের সঙ্গে জুড়ে থাকে উপসর্গ, প্রত্যয় বা বিভক্তি এবং বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া এবং অন্যান্য শব্দগুলো পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ভাষা আছে যেসব ভাষায় শব্দের সঙ্গে কোনো উপসর্গ-প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত থাকে না। বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান দেখে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়। এই ধরনের ভাষা হলো চিনা ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা, ভারতীয় ভোটচিনা ভাষা। এই শ্রেণিবিভাগের নাম অনন্বয়ী বা অসমবায়ী (Isolating/Positional)। আবার অন্যদিকে যদি পদ গঠিত হয় বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহায্যে এবং শব্দের উপাদানগুলিকে আলাদা করলেও স্বতন্ত্র অর্থ বজায় থাকে এবং স্বাধীনভাবে যে-কোনো পদগঠনে ব্যবহারও করা যায়, তাহলে এই ধরনটিকে মুক্তান্বয়ী (Agglutinating) বর্গ বলা হয়। তুর্কি ভাষা এই শ্রেণির উদাহরণ। এছাড়াও আফ্রিকার সোয়াহিলি-র নামও করা যায়। উপসর্গ-অনুসর্গ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে মুক্তান্বয়ী বর্গকে কয়েকটি উপবর্গে ভাগ করা যায়। আফ্রিকার বান্টু ভাষাগোষ্ঠী, উরাল, আলতাই, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা এইসব শ্রেণির অন্তর্গত। আবার এমন

ভাষাও আছে যেখানে বাক্যের বাইরে শব্দের কোনো স্বাধীন সত্তাই নেই, শুধু কিছু অসম্পূর্ণ ভাবের বাহক মাত্র। এক্ষেত্রে শব্দ বা পদ নয়, বাক্যই হল বাগ্‌ধারার নিম্নতম অংশ। যেমন, 'aulisariartorsuarpok' (সে তাড়াতাড়ি মাছ ধরতে যাচ্ছে)। aulisar = 'মাছ ধরা' + peartor = 'কাজে নিযুক্ত হওয়া' + (pinne) suarpok = 'সে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে'। এই এস্কিমো ভাষা যে শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলা হয় অত্যন্বয়ী (Incorporating) বর্গ।

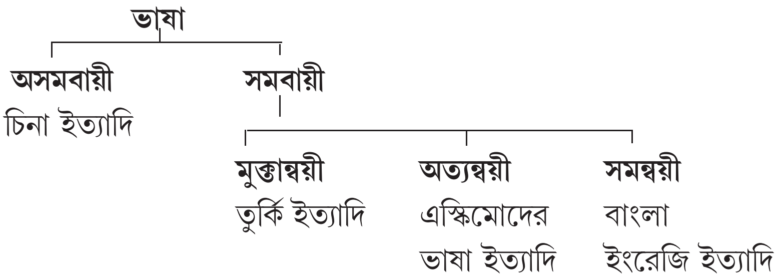

আবার সংস্কৃত, বাংলা, লাতিন, ইংরেজি, আরবি প্রভৃতি বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান ভাষাতে দেখা যায় যে প্রত্যয়-বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতি সম্পর্কজ্ঞাপক চিহ্নগুলি এমনভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় যে আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। এই ধরনটিকে বলা হয় সমন্বয়ী (Inflectional/Synthetic) বর্গ।

গোত্র বা বংশানুযায়ী বিভাগ :

বর্তমান পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাষায় এমন কিছু সাদৃশ্য আছে, যা থেকে ভাষাবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে সেইসব ভাষাগুলি অতীতে কোনো একটি ভাষা থেকেই এসেছে। অতীতের সেই ভাষাগুলির কথা মাথায় রেখে একেকটি ভাষাবংশের নামকরণ করা হয়। একই বংশজাত ভাষাগুলিকে বলা হয় সমগোত্রজ (Cognate) ভাষা।

এরকম প্রায় ২৫/২৬টি ভাষা পরিবারে বর্গীভূত হয়েছে পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষাই। যে ভাষাগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি, সেগুলিকে 'অগোষ্ঠীভূত ভাষা' বলা হয়। যাই হোক, যেসব ভাষাবংশ ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে, সেগুলির মধ্যে প্রধান বংশগুলি হল : ১. ইন্দো-ইউরোপীয়, ২. সেমীয়-হামীয় ৩. বান্টু ৪. ফিনো-উগ্রীয় বা উরালীয় ৫. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বা আলতাইক ৬. ককেশীয় ৭. দ্রাবিড় ৮. অস্ট্রিক ৯. ভোট-চিনীয় ১০. প্রাচীন এশীয় ১১. এসকিমো, ১২. আমেরিকার আদিম ভাষাসমূহ ইত্যাদি।

এই বংশগুলির মধ্যে বৃহত্তম ইন্দো-ইউরোপীয়* ভাষাবংশ। ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পুবে ভারত পর্যন্ত যতগুলি দেশ, তার বেশিরভাগ ভাষাই এই ইন্দো-ইউরোপীয় জাত। ইতালীয়, গ্রিক, তিউনিশীয়, কেলতীয়, তোখারীয়, আলবেনীয়, বালতো-স্লাভীয়, আরমেনীয় এবং ইন্দো-ইরানীয়—মোট নটি ভাষাগোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত।

---

* ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার পাশাপাশি আরেকটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার নাম হিট্টি, বা হিট্টাইট। এই দুই শাখার পূর্ববর্তী নাম ইন্দো-হিট্টি। কিন্তু হিট্টাইটের তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তাই এ বংশের নাম ইন্দো-ইউরোপীয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্যস্পৃষ্ট ধ্বনি পরবর্তী রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে এই বংশের ভাষাগুলিকে দুটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে : কেন্তুম্ ও সতম্।